উৎসর্গ

পৃথিবীর সমস্ত নির্যাতিতা নারীদের
উদ্দেশ্যে ।

এ-লেখকের অন্যান্য বই

আলোর চাবুকে

পদ্মা মেঘনা বহ্মপুত্র

বিদ্রোহী পূর্ব বাংলা

ব্যভিচার যুগে যুগে

রাত্রির নরক

হীরাঝিলের জলসাঘরে

জীবন থেকে নেয়া

হটলাইন হঠকারী

ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর

নগ্ন প্রহর

লোভের সোনা কামের হীরা

কফি থেকে কফিন

প্রকাশকের নিবেদন

'ব্যভিচার যন্ত্রে ব্যভিচার তন্ত্রে' নামক বইটি প্রকাশ করার কেন সিদ্ধান্ত নিলাম? এ-প্রশ্ন হয়তো অনেকের মনেই উঁকি দেবে।

এ-সম্বন্ধে আমি সামান্য কয়েকটি কথা বলব। পৃথিবীতে নারীদের নিয়ে আজো এমন অনেক অন্যায়, অনেক পাপ কাজ চলছে—যা ধর্মের নামে, দেশ সেবার নামে, প্রচলিত করে নিয়েছে মানুষ। তাই যে যেখানে পেরেছে, ধর্ম অধর্মের দোহাই দিয়ে করেছে এবং আজও করে চলেছে নারীনির্যাতন।

Babhichar Jantrya Babhichar Tantrya

by

Anil Roy.

Rs. 12·00

ব্যভিচার যন্ত্রে
ব্যভিচার তন্ত্রে

ব্যভিচার যন্ত্রে
ব্যভিচার তন্ত্রে

সন্ধ্যে সাতটার সময় অমাবস্যা লেগেছে। এখন রাত ন'টা তো হবেই।

ঘিয়ের প্রদীপটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল উদ্ধব দাস। পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। হাত কয়েক দূরে গিয়েই দৃষ্টি হারিয়ে যায়।

তবু পা বাড়াল উদ্ধব দাস। উঠোনটা পার হয়ে ওদিকে যেতে হবে। উঠোনের মাঝামাঝি এসে প্রদীপের সলতেটা উসকে দিয়েই চমকে উঠলো উদ্ধব দাস।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

প্রদীপের কাঁপা কাঁপা আলোয় দেখতে পেলো মালতির আঁকা আলপনার উপরে গিয়ে পড়েছে উদ্ধব দাসের ডান পা খানা।

পিছিয়ে গেল কয়েক পা। তারপর প্রদীপ নিয়ে কোমড় মুড়ে ঝুঁকে পড়ল। সারা সকাল ধরে গোবর জলের ছড়া দেবে মালতি। তারপর নিকিয়ে নেবে সমস্ত উঠোন। গোবরের গোলা শুকিয়ে গেলে চালবাটা গুলে নিয়ে মালতি বসবে উঠোনে আলপনা দিতে। তারপর সারা দিন ধরে মালতির সতর্ক দৃষ্টি ওর নিজের হাতে আঁকা আলপনা পাহারা দেবে। কেউ পা দিলে তার আর রক্ষে নেই।

সারা দিনে কতবার উদ্ধব দাসের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে মালতীর দেওয়া আলপনার উপরে।

ভাল লাগে। আশ্রমের নতুন এক শ্রী এনে দেয় মালতির হাতের আঁকা আলপনা। মনটা খুশীতে ভরে ওঠে।

গাছকোমড় করে শাড়ী পরে ঘুর ঘুর করে বেড়ায় মালতি। কখনো

যদি কোন অসতর্ক মুহূর্তে ওর নিজের পা গিয়ে পড়ে আলপনার কোন প্রান্তে, থমকে দাঁড়ায়। দাঁত দিয়ে জিভ কাটে। তারপর ঠাসঠাস করে নিজের গালেই চড় মারে।

সভয়ে হাত কয়েক পিছিয়ে এলেন উদ্ধব দাস।

প্রদীপের শিখাটা দুলে উঠলো।

সকালে উঠে মালতি যদি দেখতে পায় তার সযত্নে আঁকা আলপনা কেউ দলে গেছে তাহলে আর রক্ষা নেই। মালতি ঝড়ের মতো এসে আছড়ে পড়বে উদ্ধব দাসের গায়ের ওপর। ওর ধারণা, উদ্ধব দাসের মত অকর্মা আখড়ায় দ্বিতীয় নেই। আখড়ার সমস্ত অপকর্মের জন্যে কেউ যদি দায়ী থাকে তবে সে উদ্ধব দাস।

আবার ঝুঁকে পড়ল উদ্ধব দাস। মিনিট খানেক ধরে পরীক্ষা করল।

না, মালতির আঁকা আলপনায় উদ্ধব দাসের পায়ের ছাপ পড়েনি।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো উদ্ধব দাস। কতো সুন্দর আলপনার হাত ঐ মেয়েটার। একবার তাকালে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নেয় কার সাধ্য।

কিন্তু আর তো দেরী করা চলে না।

রাত হয়েছে। সারা দিন খাটুনী গেছে। চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে আসছে। তবু ওকে যেতেই হবে। সন্ধান নিতেই হবে।

আখড়াতে সবাই ঘুমে অচেতন।

কোথাও কারো কোন সাড়াশব্দ নেই। কুকুরটা রোজ ঘেউ ঘেউ করে, আজ ওটাও ডাকছে না।

উদ্ধব দাস এবার মাটির ওপর থেকে চোখ সরিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। কালো আকাশে একরাশ উজ্জ্বল নক্ষত্র।

সতর্ক পদক্ষেপে উঠোনটুকু পার হয়ে উদ্ধব দাস ঘরের দাওয়ায় উঠে এলো। নিঃশব্দে তাকালো ঘরের দরজার দিকে।

উদ্ধব দাস যেন ভাল করেই জানে হাত দিয়ে ঠেললেই ওঘরের দরজা

খুলে যাবে। আশ্রমে দরজা বন্ধ করে শোবার নিয়ম নেই। প্রয়োজনও হয় না।

দরজার সামনে এসে কয়েক মুহূর্তের জন্য উদ্ধব দাস থমকে দাঁড়াল।

মালতির নিঃশ্বাসের শব্দ বাইরে দাঁড়িয়ে ও শুনতে পাচ্ছে।

মালতী গভীর ঘুমে অচেতন।

নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলেই উদ্ধব দাস বুঝতে পারে সেটা।

রাত অনেক হয়ে গেছে।

ঘরের দরজার দিকে পিছন ফিরে উদ্ধব দাস ঘুরে দাঁড়াল।

অতিথি ভবনে জনা সাতেক। ওদের মধ্যে একজন উদ্ধব দাসের পরিচিত। অন্যেরা এসেছে সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে। ওরা নবদ্বীপ যাবে। সকালে উঠেই রওনা দেবার কথা। আলো নিভিয়ে তাই শুয়ে পড়েছে সকালে ওঠার ভয়ে।

নবনী দাস নিয়ম করে গেছেন আশ্রম থেকে কোন অতিথি ফিরে যাবে না। যে কেউ এখানে এসে তিন দিন থাকতে পারবে। সেই তিন দিনের সমস্ত খরচ ব্যয় হবে আশ্রমের কোষ থেকে। নবনী দাসের সেই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি একটি দিনের জন্যও।

সেই নিয়ম এখন পর্যন্ত বজায় রেখেছে উদ্ধব দাস।

কষ্ট হয়।

খরচ অনেক বেড়ে গেছে।

আশ্রমের স্থায়ী অধিবাসীরা সংখ্যায় বেড়েছে অনেক। বেড়েছে ঠাকুরের ভোগের খরচ। খরচের অনুপাতে আখড়ার আয় বাড়েনি নবনী দাসের আমলের সেই চল্লিশ বিঘে জমিই রয়েছে আশ্রমের নামে খরচ কুলিয়ে চল্লিশকে একচল্লিশে পরিণত করতে পারেনি উদ্ধব দাস।

অতিথি ভবন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে উদ্ধব দাস এবার হরিমতীর ঘরের দিকে তাকাল।

ও ঘর হরিমতীর।

কেমন যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে উদ্ধব দাস। ডুবে যেতে থাকে

স্মৃতির কালো গভীরে।

সেই কবে আশ্রমে এসেছিল হরিমতী।

নবনী দাস তখনো আশ্রমের কর্ণধার ছিল।

আর পাঁচজন আখড়াবাসীর মত ছিল উদ্ধব দাস। সে তখন সবে নবনী দাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করেছে।

উঃ—

বা হাত দিয়ে প্রদীপের শিখাটাকে আড়াল করবার চেষ্টা করল উদ্ধব দাস।

কি ভীষণ ঝোড়ো রাত ছিল সেটা।

স্পষ্ট মনে আছে উদ্ধব দাসের।

ঝড়ের সে কি দাপট! ঝড় তো নয় যেন সাতশো রাক্ষসীর সেই বুকফাটা আর্তনাদ।

সন্ধ্যে থেকে শুরু হয়েছিল ঝড়। রাত বেশী হলে বৃষ্টি শুরু হল। ঝুপ ঝুপ সেকি বৃষ্টি! সেই ঝুপ ঝুপ একটানা বৃষ্টি অপেক্ষা বুঝি ঝড়ই অনেক ভাল ছিল।

ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে পুঁথি পড়ছিল নবনী দাস।

তন্ময় হয়ে শুনছিল উদ্ধব।

হঠাৎ যেন জেগে উঠল উদ্ধব।

দরজায় কেউ করাঘাত করছে।

উদ্ধব?

পুঁথি পড়া বন্ধ করে নবনী দাস উদ্ধবের দিকে চেয়েছিলেন। স্পষ্ট মনে আছে উদ্ধব দাসের। বড় বড় দুটো চোখ বিস্ময়ে আরো বড় হয়ে উঠেছিল।

এতো রাতে জলঝড়ের মধ্যে কে আসতে পারে উদ্ধব?

উদ্ধব নিজেও বিস্মিত হয়েছে। কে আসবে এই জলঝড়ের মধ্যে?

দৃঢ়কণ্ঠে নবনী দাস উত্তর দিয়েছিলেন—

দস্যুই আসুক আর তস্করই আসুক নবনী দাসের আখড়া থেকে কেউ ফিরে যাবে না উদ্ধব। যাও দরজা খোল।

উদ্ধব উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

দরজা খোলা পেয়ে হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল একজোড়া তরুণ তরুণী।

নবনী দাসের দিকে ফিরে দুই হাত এক করে তরুণ বলেছিল—

আজ রাতের মত আমরা আশ্রয় চাই ঠাকুর। আমারা বিপন্ন।

আমি তো আশ্রয় দেবার মালিক নই বাবা।

নবনী দাসের বড় বড় দুই চোখে তখন কি যেন নেমে এসেছে।

তবে ?

বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল তরুণের মুখমণ্ডল।

এই জলঝড় এই দুর্যোগের রাতে আপনি আমাদের ফিরিয়ে দেবেন ঠাকুর ?

এবার তরুণী এগিয়ে এসেছিল।

তরুণীর গোলাপী অঙ্গে লাল শাড়ী জলে ভিজে লেপ্টে গেছে। তরুণেরও সেই একই অবস্থা।

আমি তো তোমাদের চলে যেতে বলিনি ঠাকুর।

নবনী দাস দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন।

বাইরে তখনো সমানে ঝোড়ো বাতাস বইছে। ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে বৃষ্টির ছাট।

আপনি তাহলে আমাদের আশ্রয় দেবেন ?

তরুণী আর এক পা এগিয়ে গেল নবনী দাসের দিকে। কাপড়ের জল মেঝেয় পড়ছে।

এবার নবনী দাস চোখ বন্ধ করলেন। বললেন—

আশ্রয় দেবার মালিক ভগবান। তিনিই যে তোমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। আমি তোমাদের ফেরাবো কেমন করে ?

আমি জানতাম, ঠাকুর আমাদের ফিরিয়ে দিতে পারবেন না।

তরুণী আবেগে তরুণের একখানা হাত চেপে ধরল।

কেমন বলিনি তোমাকে, এখানে আমরা আশ্রয় পাবোই।

উদ্ধব ?

কি ঠাকুর ?

নবনী দাস তার অভ্যেস মত চোখ বুঁজলেন। তারপর একটু থেমে বললেন—

এদের জন্যে শুকনো বস্ত্রের ব্যবস্থা করো উদ্ধব। আর—

আর কি ঠাকুর ?

উদ্ধব উঠে দাঁড়াল।

কিছু সেবার ব্যবস্থাও করতে হবে যে।

আমাদের জন্যে আপনাদের ব্যস্ত হতে হবে না ঠাকুর।

ওরা উভয়েই একসাথে প্রতিবাদ করে উঠেছিল।

তা হয় না ঠাকুর। গোবিন্দ নিজে তোমাদের পাঠিয়েছেন। তোমরা অনাহারে থাকলে গোবিন্দ রুষ্ট হবেন। তাতে আশ্রমের অকল্যাণ, হবে।

বাতাসে আলোর শিখাটা দুলে দুলে উঠছে। বাঁ হাত দিয়ে আড়াল দেবার চেষ্টা করল উদ্ধব দাস।

হরিদাসীর ঘরের দরজাও বন্ধ হয়ে গেছে। জপ শেষ করে হরিদাসী শয্যায় আশ্রয় নিয়েছে।

হাসি এলো উদ্ধব দাসের মুখে।

কত সম্ভব অসম্ভব কাহিনী না জড়িয়ে রয়েছে এই আশ্রমের সাথে। মনের ঝাঁপি খোলা পেলে হুড়মুড় করে সব বেরিয়ে আসতে চায়।

এই নাও ঠাকুর।

উদ্ধব হাতে দু'খানা ভাঁজভাঙা থান নিয়ে এলো।

হাত বাড়িয়ে দু'জনে দু'খানা থান নিল।

নাও ঠাকুর নাও ঠাকরুণ—ভিজে কাপড়গুলো খুলে ফেলো। গায়ে জল বসলে অসুখ করবে।

তবু দু'জনে ইতস্তত করছিল।

উদ্ধব?

কি ঠাকুর?

এদের পাশের ঘরখানা দেখিয়ে দাও।

তাই করল উদ্ধব। ওদের দেখিয়ে দিল পাশের ঘর। তারপর ফিরে এলো নবনী দাসের কাছে।

ফিরে এসে উদ্ধব দাস দেখলো নবনী দাস এক দৃষ্টিতে পুরুষোত্তমের দিকে চেয়ে আছেন। নবনী দাসের চোখের পলক পড়ছে না। বুকখানা দ্রুত ওঠানামা করছে। মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেছে।

কি বল উদ্ধব?

তবে কি আবার ভাব এলো ঠাকুরের!

একরাশ চিন্তা নিয়ে অপেক্ষা করে রইল উদ্ধব।

মিনিট খানেক পরেই নবনী দাস চোখ মেললেন। উদ্ধবের দিকে তাকিয়ে বললেন—

ওদের ওঘরে দিয়ে এসেছো উদ্ধব?

আজ্ঞে।

বলেছো কাপড় ছেড়েই যেন এখানে চলে আসে?

বলেছি।

ঠাকুর ঠাকুর।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন নবনী দাস। মাঝে মাঝে নবনী দাসকে কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হয়। অত্যন্ত পরিচিত লোক—তখন কত অপরিচিত হয়ে ওঠে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ওরা ঘরে ফিরে এলো।

বোসো ঠাকুর, বোসো এইখানে।

নবনী দাস নিজেই উঠে গিয়ে দু'খানা আসন ঘরের কোণ থেকে এনে পেতে দিলেন।

সলজ্জ ভঙ্গীতে দু'জনে এসে বসল।

উদ্ধব !

আজ্ঞে ?

ওঘরের ভিজে কাপড়গুলো শুকোবার ব্যবস্থা করো।

উদ্ধব পাশের ঘরে চলে এলো।

এক কোণে একটা পিঁড়ির ওপরে জড়ো করে রেখে গেছে। পরিত্যক্ত জামাকাপড়গুলো তুলে নিয়ে ঘরের এক কোণে টাঙানো দড়িতে একে একে সব মেলে দিল।

বাইরে ঝড়ের দাপট যেন ক্রমেই বাড়ছে। বাড়ছে বৃষ্টিও। বাড়ছে বাজ পড়ার শব্দ।

বাইরে ঘরের চালের ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে বিদ্যুতের আলো ঢুকছে।

কাজ সেরে উদ্ধব ফিরে এলো এঘরে।

উঃ! কি ভীষণ রূপ মেয়েটার অঙ্গে। আশ্রমের সাদা থানের ভেতর দিয়ে রূপ যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

দু'চোখ যেন ঝলসে যেতে চায় রূপের আগুণে।

আবার তাকাল উদ্ধব দাস।

রাধারাণীর অঙ্গেও রূপ রয়েছে। সে রূপ মনকে শান্ত করে বিস্মিত করে। কিন্তু এর রূপ মনে জ্বালা ধরিয়ে দিতে চায়। সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। রাধারাণীর রূপ এমন করে তো কখনো মনের মধ্যে আগুণ ধরিয়ে দেয় না? কেন!

কেন এমন হয়!

কি নাম যেন বলেছিল মেয়েটা।

অপর্ণা না অনন্যা।

সে নাম আজ আর কারো মনে নেই। সবাই ভুলে গেছে। বুঝি হরিদাসীও ভুলে গেছে—একদা তার নাম ছিল অপর্ণা অথবা অনন্যা।

হরিদাসীর পাশের ঘর উদ্ধবের। উত্তরের পাতার আধচলায় থাকে

আশ্রমের পুরুষ সেবকেরা।
তাদেরও কোন সাড়াশব্দ নেই। রাত্রির গভীরে সবাই ঘুমে অচেতন।
উদ্ধব দাস এবার আকাশের দিকে তাকালো!
সেখানেও অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। মাত্র একটা নক্ষত্র ছাড়া আর সবাই নিজেরা নিজেদের স্থান পরিবর্তন করে দূরে দূরে সরে গেছে।
আবার ঘুরে দাঁড়ল উদ্ধব দাস।
দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে যাবার জন্যে হাত বাড়াল।
মালতির নিঃশ্বাসের শব্দ তেমনি আসছে।
কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের দরজা খুলে উদ্ধব দাস ঘরের ভেতর ঢুকতে পারলো না।
কোত্থেকে যেন একটা দ্বিধা এসে জড়ো হলো মনের মধ্যে।
অবাক হল উদ্ধব দাস।
এমনটি কোনদিন হয় না।
আজ তু'বছর ধরে এমনি করে প্রতিরাত্রে আশায় বুক বেঁধে এঘরে এসেছে উদ্ধব দাস। আবার প্রতিরাত্রেই তাকে ফিরতে হয়েছে ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে। উদ্ধব দাসের অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ব্যর্থ হয়েছে। পরের রাত্রে আবার এসেছে উদ্ধব দাস। সে জানে সাফল্য একদিন আসবেই। সেদিন প্রতিদিনের মতো নৈরাশ্য নিয়ে ফিরতে হবে না।
উদ্ধব দাস বন্ধ দরজার দিকে তাকালো।
হাতের প্রদীপের শিখাটা ঘন ঘন আন্দোলিত হচ্ছে।
আজো কি তাকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হবে? আজ অমাবস্যার কালো রাত। আজো কি এক বুক নিরাশা নিয়েই তাকে ফিরতে হবে? আজো কি নবনী দাস বাবাজীর আখড়ার নীরবতা ভঙ্গ হবে না?
কে জানে কি হবে।
মনের মধ্যে যত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল হঠাৎ সব যেন ঝেড়ে ফেলল উদ্ধব দাস।
খুলে ফেলল মালতির ঘরের দরজা।

অতি নিঃশব্দে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সে দরজা খুলতে পেরেছিল। কিন্তু অনেক দিনের পুরোনো দরজা ক্যাচ্ ক্যাচ্ শব্দে যেন আর্তনাদ করে উঠলো।

সতর্ক হল উদ্ধব দাস।

হাত দিয়ে আড়াল দিল হাতের প্রদীপটাকে।

কান পাতল।

না। মালতীর নিঃশ্বাস তেমনি জোরেই পড়ছে।

ঘরের মধ্যে থেকে প্রতিবারের মত আজো গোলাপের গন্ধ ভেসে আসছে। মালতি গোলাপের গন্ধ ভালবাসে। তাই বাজার খুঁজে খুঁজে গোলাপের ধূপ কিনে আনতে হয়।

এই তো মাত্র গত বছরের কথা। উদ্ধব দাস কোথাও খুঁজে পেলো না গোলাপের ধূপ। সে রাতে মালতির সে কি কান্না! সারা রাত মেয়েটা ঘুমাতে পারে নি। সারা রাত সে কাটিয়েছিল বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে।

উদ্ধব দাস নিজেও ঘুমাতে পারেনি মালতিকে জাগিয়ে রেখে। সমস্ত রাত তারও কেটে ছিল আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

রাতভোর হেমন্তের শিশিরে ভিজে সকালের দিকে জ্বর এসেছিল মালতির।

ভয় পেয়েছিল উদ্ধব দাস। সেকথা ভাবতে আজো ভয় পায় উদ্ধব দাস।

দিন যায় রাত যায় জ্বর বাড়তেই থাকে। আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকে মালতি।

ডাক্তার আসে, বৈদ্য আসে কিন্তু জ্বর নামবার লক্ষণ নেই। এক কবিরাজ তো বলেই বসলেন এসান্নিপয়তিক।

উদ্ধব দাস মালতিকে নিয়ে কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। শেষে হরিদাসী এসে মালতির ভার নিলে তবে নিঃশ্বাস ফেলার সময় পায়।

সেই থেকে দ্বিতীয়বার আর ভুল করেনি উদ্ধব দাস।

ঘরের মধ্যে সূচীভেদ্য অন্ধকার।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সলতেটা আরো খানিকটা উস্কে দিল।

কদিন ধরেই চোখ দুটোয় কি যেন হয়েছে। রাত্রের দিকে সবকিছু ঝাপসা হয়ে ওঠে। ঘোলাটে ঘোলাটে দেখায়।

বয়সও তো কম হল না। চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে।

ঘরের মাঝখানে চলে এলো উদ্‌ধব দাস। সলতেটা যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্ধকার তবু পুরো কাটেনি।

পুব কোণে আলো-আঁধারের রহস্যজাল নিজের চারপাশে ছড়িয়ে রেখে মেঝের ওপর শুধু একখানা নকসিকাটা কাঁথা বিছিয়ে শুয়ে আছে মালতি।

মালতির দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল উদ্‌ধব দাস।

মালতির আজকের শোবার ভঙ্গিটা একটু ভিন্ন ধরনের বলে মনে হল। মালতি সাধারণত চিৎ হয়ে ঘুমায়। আজ তো ডানদিক পাশ ফিরে শুয়েছে।

কতবার উদ্ধব দাস মালতীকে নিষেধ করেছে ঐ বাসন্তী রঙের শাড়ীটা পরতে। সে নিষেধ কোনবারই শোনেনি মালতি। আজকাল বরং বেশী করে পরতে শুরু করেছে। হয়তো তাকে রাগাতে চায় মালতি।

আজ সকালেও একখানা সাদা শাড়ী বাসন্তী রঙে ছুপিয়েছে।

হাসি পেল উদ্ধব দাসের।

মালতি জানে উদ্ধব দাস বাসন্তী রঙ কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। তাই সে বেশী করে বাসন্তী রঙ পড়ে, ওকে রাগাবার জন্যে।

মালতি সামনে পড়লে কপট রাগের ভঙ্গী করে উদ্ধব দাস।

মালতি অসাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

উদ্ধব দাস জানে মালতির ঘরের মেঝেতে পা দিলে পিছলে যাবার সম্ভাবনা। মালতি নিজেই শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না। আখড়ার অন্য সবাইকে পরিষ্কার থাকতে বাধ্য করে।

উদ্ধব দাসের দিকে তার বিশেষ নজর।

আশ্রমের কোথাও কুটোটি পড়ে থাকার উপায় নেই।

আরো দুই পা এগিয়ে গেল উদ্ধব দাস।

বিব্রত করতে শুরু করেছে গোলাপের গন্ধটা। ধুপকাঠিগুলো নিজেরা পুড়ে পুড়ে শেষ করে দিলেও গন্ধের মধ্যে দিয়ে বেঁচে রয়েছে।

প্রতিদিন রাত গভীর হলে উদ্ধব দাস একবার করে এই ঘরের মধ্যে আসে। আর তখনই মনটা যেন তার কেমন হয়ে যায়।

কি মায়া যেন মালতি ছড়িয়ে রেখেছে এ ঘরে।

ঘরের এক কোণে ছোট্ট একটা আলনায় মালতির শাড়ীগুলো ঝুলছে। গুণে গুণে চারখানা শাড়ী মালতির।

উদ্ধব দাস জানে চারখানা শাড়ীতে কোন মেয়ের ভালভাবে চলতে পারে না। চলা সম্ভবও নয়। নতুন ক'খানা শাড়ী কেনার কথা সে বলেছিল মালতিকে।

ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল মালতি।

আশ্রমের মানুষ আমরা। আমাদের এতো কেন ঠাঁটবাট হবে ঠাকুর?

বাধা দিয়ে উদ্ধব দাস বলেছিল—

এটা ঠাঁটের কথা নয় মালতি—এ আব্রু রক্ষার উপায়।

চারখানা শাড়ীতেই তা হবে ঠাকুর।

তারপরেই মালতি অন্যত্র চলে গিয়েছিল।

মালতি ঘুমোচ্ছে।

ভ্রমরকালো চুলগুলোর কয়েক গোছা ওর মুখের ওপরে নেমে এসেছে! শাড়ীর আঁচল লুটিয়ে রয়েছে মেঝের ওপর।

এগিয়ে গিয়ে উদ্ধব দাস শাড়ীর উপরে হাত রাখলো। জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে শাড়ীটা। তবু কত যত্নে ভাজ করে রেখে দিয়েছে।

এবার উদ্ধব দাস তার ডান হাতের প্রদীপটা বাঁ হাতে নিয়ে এলো

ঝুঁকে পড়ল মালতির মুখের উপরে।

আহা! কি গভীর ঘুমে অচেতন মেয়েটা।

ওর মুখের দিকে তাকালে মায়া হয়। কিন্তু উপায় নেই। উদ্ধব দাসের কাছে কর্তব্য সবার উপরে। সেখানে মোহ মায়া মমতার কোন স্থান নেই।

উদ্ধব দাসের চোখ দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

আজ অমাবস্যা।

মনে মনে হিসেব করল উদ্ধব দাস। এমন তিথি কাছাকাছি নেই। আজো কি মালতি তাকে নিরাশ করবে? প্রতি রাতের মত আজকেও কি ফিরতে হবে ব্যর্থতা নিয়ে?

মালতির মুখের আরো কাছে নিজের মুখখানা নিয়ে গেল উদ্ধব দাস!

ওর ডান হাতখানা এগিয়ে যাচ্ছে মালতির দিকে।

হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে।

বিব্রত বোধ করল উদ্ধব দাস।

বাতাসের শীতল স্পর্শে ঘুম পাতলা হয়ে গেছে মালতির।

মালতি পাশ ফিরলো।

উঠে দাঁড়াল উদ্ধব দাস।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে! অতি সন্তর্পণে বন্ধ করে দিল দরজার পাল্লা। তারপর দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অত্যন্ত সন্তর্পণে।

এ বড় লজ্জার কথা হবে।

উদ্ধব দাস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফিরে তাকালো মালতির দিকে।

মালতি জেগে উঠে তাকে একেবারে কাছে দেখতে পেলে বড় লজ্জায় পড়ে যাবে।

কেটে গেল কয়েকটা মুহূর্ত।

মালতীর নিঃশ্বাস আবার ভারী হচ্ছে। গভীর ঘুমের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে মেয়েটা। আরো একটু অপেক্ষা করতে হবে।

নিশিথ রাত্রে এমনি করে এই ঘরে তার উপস্থিতি কোন মতেই উদ্ধব দাস মালতির গোচরে আনতে চায় না।

প্রায় মিনিট দশেক একইভাবে অপেক্ষা করার পর ধীর পায়ে এগিয়ে গেল মালতির কাছে।

প্রদীপের মোটা সলতেটা উস্কে দিল সামান্য। তারপর ঝুঁকে পড়ল মালতির মুখের কাছে। সেই চোখ সেই মুখ সেই আদল।

উদ্ধব দাসের মনে পড়ে যায় একটা ছোট্ট মুখের কথা।

পটলচেরা টলটলে দুটো চোখ. একরাশ কালো চুল। মেয়েটার রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। টলটলে চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল নিয়ে সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই ওর ছোট্ট মুঠো হাত তুলে প্রশ্ন করছে. আমার মাকে দেখেছো ?

তোমার মা ? কই নাতো।

যণ্ডামার্কা এক বাবাজী তার ক্ষীণকায়া বৈষ্ণবীর হাত ধরে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। নবনী দাস মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলেন। মেয়েটাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

উদ্ধব নিয়ে আয়তো মেয়েটাকে।

উদ্ধব এগিয়ে গেল।

খুকী ?

সামনে উদ্ধব দাসকে দেখতে পেয়ে মেয়েটা তার ডাগর ডাগব দুটো চোখ তুলে তাকাল।

চোখের জল তখন গালে নেমে এসেছে।

তুমি দেখেছো আমার মাকে ? দেখেছো ?

ছোট্ট দুটো হাত তুলে মেয়েটা উদ্ধব দাসের দিকে এগিয়ে এলো।

কেমন যেন বিভ্রান্ত বোধ করল উদ্ধব দাস নিজেকে।

আহারে! আর ওর মা-টাই বা কেমন পাষানী মেয়ে। এমন মেয়েকে কেউ হারাতে পারে ?

এদিকে এসো খুকী ?

চারদিকে মানুষের প্রচণ্ড ভীড়। একপাশে সরে গিয়ে উদ্ধব দাস ওকে ডাকলো—এদিকে এসো খুকী।

তুমি আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাবে?

এসো না এদিকে।

উদ্ধব দাস মেয়েটার হাত ধরে ওকে নিয়ে এলো নবনী দাসের কাছে।

নবনী দাস এগিয়ে গেলেন মেয়েটার কাছে। হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়লেন ওর সামনে। বললেন, আমি খুঁজে দেবো তোমার মাকে। কোন ভয় নেই তোমার।

নবনী দাস মেয়েটার একরাশ ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে তার হাতের আঙ্গুল ডুবিয়ে দিয়ে উদ্ধবকে ডেকে বললেন—

উদ্ধব?

কি ঠাকুর?

রামকেলির মেলায় আসা আমার সার্থক হয়েছে উদ্ধব। চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ উদ্ধব স্বয়ং রাধারাণী যেন মন্দিরের পাথরের মূর্তি ছেড়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এই শিশুর রূপ ধরে। এতো রূপ যে একমাত্র রাধারাণীতেই সম্ভব। মেয়েটার চিবুক ধরে নবনী দাস প্রশ্ন করলেন—

তোমার নাম কি মা?

আমার মা কোথায়?

মেয়েটা প্রশ্ন করল।

তোমার মা নিশ্চয় আসবে খুকী। সমস্ত জেলা খুঁজে আমি তোমার মাকে এনে দেবো। কিন্তু তোমার নাম কি বলতো খুকী।

আমার নাম?

হ্যাঁ মা।

নবনী দাসের চোখ দুটো চঞ্চল হয়ে উঠলো।

আমার নাম মালতি।

বাড়ী কোথায় তোমাদের?

সুন্দরপুর।

মেয়েটার চোখের জল তখন পরনের পিরানে

উদ্ধবের চোখ ফিরছে না।

সুন্দরপুর।

বিস্মিত হয় নবনী দাস।

সুন্দরপুরের নাম তো তিনি কখনো শোনেন নি?

জেলার নাম বলতে পারো?

নবনী দাস ঝুঁকে পড়লেন মেয়েটার মুখের উপরে।

আমার মাকে এনে দেবে বললে, কই দাও।

দেবো মা দেবো।

এবার নবনী দাস আর স্থির থাকতে পারলেন না। জড়িয়ে ধরে নিলেন বুকের মধ্যে।

উদ্ধবের দিকে তাকিয়ে বললেন—

উদ্ধব যাও ওর মাকে খুঁজে নিয়ে এসো।

মেয়েটার চোখের জল মোছাতে মোছাতে বললেন—সমস্ত জেলা হাতড়ে তোমার মাকে খুঁজে নিয়ে আসবো মা।

মেয়েটাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে অভয় তো দিলেন কিন্তু তার চিন্তা হল—কেমন করে এই অসাধ্য সাধন করবেন।

বেলা বাড়ছে। সূর্যের তেজ বাড়ছে। শেষ জ্যৈষ্ঠের আগুণ ছড়াতে শুরু করলো চারদিকে। আগামীকাল পয়লা আষাঢ়। অথচ আকাশে এক কণা মেঘও নেই।

সামনের পথ ধরলেন নবনী দাস। পথ চলে গেছে মন্দির পর্যন্ত।

পথের দু'পাশে যাকে পাচ্ছেন তাকেই শুধাচ্ছেন—

তোমাদের কারো মেয়ে হারিয়েছে?

সবাই মাথা ঝাঁকাল। কেউ কেউ ফিরেও তাকাল না।

আরো এগিয়ে চল্লেন নবনী দাস। দূরে মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। এদিকে ভীড় অত্যন্ত বেশী।

মেয়েটা নবনী দাসের গলা জড়িয়ে ধরেছে। ঝুলছে বুকের উপর।
পথের হু'পাশের এক'শো হাজার মানুষকে জিজ্ঞাসা করলেন নবনী দাস। কেউ বলতে পারলো না। বলতে পারলো না মেয়েটার মা কোথায়।
সকলেরই চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন নবনী দাস। বেশীর ভাগ চোখকেই তিনি কেন যেন জ্বলে উঠতে দেখলেন।
ভয় পেয়ে মেয়েটাকে আড়াল করে দাঁড়ালেন নবনী দাস।
ক্রমে বেলা হু'টো বাজলো।
মাকে এনে দেবার জন্যে মালতি কেবলই তাগাদা দিচ্ছে।
মনে মনে অস্থির হচ্ছেন নবনী দাস।
উদ্ধবকে পাঠিয়েছেন মেলার মধ্যে দেখে আসতে ।
তবু কেউ বলতে পারলো না মালতির মা কোথায়।
ক্রমে বেলা পাঁচটা বাজলো।
পরিশ্রান্ত নবনী দাস ঠিক করলেন মালতিকে নিয়ে যাবেন। অথবা প্রয়োজন বুঝলে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন মালতির ভার। তার রাধারাণীর ভার। মেলার কর্ত্তৃপক্ষ সব শুনলেন। তারা মাইকে করে তখন প্রচারের ব্যবস্থা করলেন।
সুন্দরপুরের মালতি নামে ছয় সাত বছরের একটি মেয়েকে পাওয়া গেছে। আত্মীয়স্বজনকে অনুরোধ করা হচ্ছে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে তাঁরা যেন মেয়েটিকে নিয়ে যান।
সন্ধ্যে হয়ে এলো।
মেলার প্রাঙ্গণে চারদিকে আলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া মেয়েটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে কেউ এলো না।
চিন্তিত কর্ত্তৃপক্ষ এবার পুলিশে খবর দিলেন।
ক্লান্ত মালতী তখন নবনী দাসের বুকে ঘুমে আচ্ছন্ন। পুলিশ অফিসার এসে বললেন, আজকের রাতটা ও আপনার কাছেই থাক। এই

ফাঁকে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব মেয়েটাকে খুঁজে বের করার জন্যে। চলে এলো নবনী দাস। মেয়েটা তখনো তার বুকে লেপ্টে রয়েছে। মুক্ত অঙ্গনের তলায় নবনী দাস মেয়েটাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে কাটালেন সারা রাত।

বয়স হয়েছে। চোখে চালসে ধরেছে। ভাল করে দেখতে পান না রাত্রের দিকে।

প্রদীপের সলতেটা আরো উস্কে দিলেন উদ্ধব দাস। সেই চোখ সেই মুখ সেই চেহারা। উদ্ধব দাসের মনে পড়ে যায় মালতির ছোট্টবেলার সেই চেহারাটা।

পটলচেরা ছটো চোখ, মাথায় একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুল, উজ্জ্বল শ্যামা রঙ। টলটলে হু'ফোঁটা জল হু'চোখে বেয়ে পড়ছে। সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই জিজ্ঞাসা করছে, আমার মাকে দেখেছো?

ছোট মেয়েটাকে নিয়ে নবনী দাসের ভাবনার অন্ত ছিল না।

মেলায় অনেক হায়না এসেছে। লোভীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে।

উদ্ধব দাস জেগেছিল সারা রাত মালতিকে পাহারা দেবার জন্যে। সে রাত কাটলো। কাটলো তার পরের রাতও। আরো একটা রাত কাটলো কিন্তু মালতির মায়ের সন্ধান পাওয়া গেল না কোথাও। অফিসের লোকজন পুলিশ উদ্ধব দাস কেউ খুঁজে বের করতে পারলো না।

তারপর মেলা ভাঙ্গার দিন এলো। সবাই ছেড়ে চলল মেলার প্রাঙ্গণ। প্রমাদ গুণলেন নবনী দাস। মেয়েটার মাকে খুঁজে বের করার সব সম্ভাবনাই শেষ হয়ে গেছে। এখন তিনি মেয়েটাকে নিয়ে কী করবেন?

চোখের সামনে শুধু হতাশার অন্ধকার। কি করবেন তিনি মেয়েটাকে

নিয়ে।

এই তিন দিনের মধ্যে একটি বারের জন্যেও মালতিকে বুক থেকে নামাতে পারেননি। ওকে বুকের মধ্যে চেপে ধরেই কোনরকমে স্নানাহার সেরেছেন। এমনকি উদ্ধব দাসের কাছেও একবার যায়নি।

মেয়েটাকে নিয়ে কি করি বলতো উদ্ধব?

অসহায় চোখে নবনী দাস তাকালেন উদ্ধবের দিকে। হাত বোলাতে লাগলেন মালতির মাথায়.

উড়ো আপদটাকে পুলিশের কাছে জমা দিয়ে দিলে হয় না?

উদ্ধব?

ধমকে উঠলেন নবনী দাস। তাকালেন মালতীর মুখের দিকে।

এই উড়ো আপদটাই আজ তিন দিন তিন রাত তার বুকে মুখ গুঁজে শান্ত হয়ে রয়েছে। হারিয়ে যাওয়া মায়ের কথাও আর উচ্চারণ করেনি কাল থেকে।

এই মেয়ে উড়ো আপদ?

এই তিন দিনের একটি বারের জন্যেও তো নবনী দাসের বিরক্তিবোধ হয়নি? একবারও তো একে আপদ বলে মনে হয়নি?

নবনী দাসের বুকের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে মালতি। মালতির মুখের ওপর দিয়ে আর একবার হাত বুলিয়ে নিলেন নবনী দাস। তারপর তাকালেন মেলা-প্রাঙ্গণের দিকে। পনেরো আনা খালি হয়ে গেছে মেলা প্রাঙ্গণ। অবশিষ্ট ক'জন এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নবনী দাস বললেন—

তাই চল উদ্ধব একে পুলিশের খাতাতেই জমা করে যাই।

উদ্ধবকে নিয়ে থানায় এলেন নবনী দাস।

কি খবর গোঁসাইজী? পুলিশ অফিসার মুখ তুললেন।

মেয়েটার ভার এবার আপনারা নিয়ে আমাকে মুক্তি দিন ঠাকুর।

কিন্তু আমরাই বা এখন একে নিয়ে কি করব? চিন্তিত হলেন পুলিশ অফিসার।

একে নিন ঠাকুর।

মালতিকে বুকের উপর থেকে নামাতে গেলেন নবনী দাস। ঠিক তখনই জেগে উঠলো মালতি। তার ছোট ছোট দুটো হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করল নবনী দাসকে।

হঠাৎ যেন উপায় খুঁজে পেলেন পুলিশ অফিসার। বললেন—

মেয়েটা আপনাকে যেভাবে আঁকড়ে ধরেছে ওকে বুক থেকে কোন রকমেই নামানো যাবে না। তার চেয়ে আপনি ওকে আশ্রমে নিয়ে যান। আমরা আপনার ঠিকানা নিয়ে রাখছি। যদি কোনদিন ওর মায়ের সন্ধান আমরা পাই আপনাকে জানাবো।

এই এক আদল এক চোখ, এক মুখ—

মালতি সেই থেকে আখড়াতেই রয়ে গেছে। মালদহের সেই পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে কোন খবর আসেনি। মালতির জীবন থেকে চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে মালতির মা ও সুন্দরপুরের গ্রাম। উদ্ধব দাস আরো একটু ঝুঁকে পড়ল মালতির মুখের ওপর। সেই ছয় বছরের মালতি আজ চোদ্দয় পা দিয়েছে সেদিনের সেই শিশু মালতি আজ যৌবনের দ্বারে করাঘাত করছে। কত পরিবর্তন হয়েছে এই সাত বছরে। নবনী দাস দেহ রেখেছেন। হরিদাসী নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। আখড়া পরিচালনার ভার পড়েছে উদ্ধব দাসের উপর।

অঘোরে ঘুমাচ্ছে মালতি।

না, আর দেরী নয়।

মালতির নিঃশ্বাসের শব্দ কমে গেছে। যে কোন সময় জেগে উঠতে পারে। তখন লজ্জায় পড়তে হবে উদ্ধব দাসকে। এ-ঘরে ঢোকার জন্যে কৈফিয়ৎ চাইবে মালতি।

নবনী ঠাকুর মেয়েটাকে আদর দিয়ে দিয়ে ঝাঁঝালো করে রেখে গেছে। অতি সন্তর্পণে মালতির দিকে হাত বাড়াল উদ্ধব দাস।

হয়তো আজো তাকে বিফল হয়ে ফিরতে হবে। অবশ্য এর জন্যে

কোন খেদ নেই, কোন আফসোস নেই তার।

উদ্ধব দাস জানে একদিন সে সফল হবেই। একদিন তার আশা পূরণ হতে বাধ্য।

মালতির ডান পায়ের কাপড় বেশ খানিকটা উঠে গেছে। সাদা পায়ের উপর কালো তিলটা আশ্চর্য সুন্দর লাগে।

অস্থির হয়ে ওঠে উদ্ধব দাস। ঐ কালো তিলটার দিকে তাকালে কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠতে চায় মনের তন্ত্রীগুলো।

উদ্ধব দাসের হাতখানা কালো তিলটার দিকে এগিয়ে যায়।

হাত দেবে ঐ কালো তিলটায়?

ঢোক ফেলে উদ্ধব দাস।

কালো তিলটা আরো কালো হয়ে উঠেছে।

বুকের ধুক ধুক শব্দটা কেবলই বাড়ছে।

কোন রকমে নিজেকে সংযত করল উদ্ধব দাস। তিলটাকে অতিক্রম করে আলগোছে হাত রাখলো মালতির পরণের শাড়ীর চওড়া লাল পাড়ের উপর।

ঠিক তখনই পাশ ফিরলো মালতি।

ঘুম ভাঙ্গছে।

ফুঃ—

ফুঃ দিয়ে প্রদীপটাকে নিভিয়ে দিল।

ঘরের মধ্যে নেমে এলো নিকস কালো অন্ধকার।

নিজের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে নিল উদ্ধব দাস।

ঘুম ভেঙ্গে ঘরের মধ্যে কারো নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলে মালতি অনর্থ বাধাবে।

নিজের বুকের ধুক ধুক শুনতে শুনতে কিছু সময় কেটে যায়।

আবার কাণ পাতে উদ্ধব দাস।

মালতির নিঃশ্বাস আবার ভারী হচ্ছে। ঘুম গভীর হচ্ছে মালতির! তবু আরো কিছু সময় অপেক্ষা করল উদ্ধব দাস। তারপর কোমর

থেকে দেশলাই বের করে জ্বেলে দিল প্রদীপটা।
ঘুম এসেছে মালতির দুই চোখে।
গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেছে সে।
এবার মালতির পরণের শাড়ী হাঁটু পর্যন্ত উঠে গেছে। উদ্ধব দাসের গোল গোল চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠলো মালতির নগ্ন হাঁটুর দিকে তাকিয়ে। এমন মসৃণ সুগোল সুন্দর সুগঠিত পা হাঁটু ও জঙ্ঘা পৃথিবীতে খুব বেশী মেয়ের হয় না।
সমস্ত শরীর হঠাৎ যেন থর থর করে কেঁপে উঠলো।
কোনরকমে উদ্ধব দাস হাত রাখলো।
হাত কাঁপছে।
উদ্ধব দাসের হাতের স্পর্শে মালতির মসৃণ জংঘা বেয়ে শাড়ীর লাল পাড় উপর উঠে যাচ্ছে। উদ্ধব দাসের অভ্যস্ত হাত আবার কেঁপে উঠলো। প্রতি রাতের দেখা মালতির ঐ জঙ্ঘা দুটো আজ যেন অত্যন্ত বেশী করে টলিয়ে দিচ্ছে ওকে।
দাঁতে দাঁত চেপে উদ্ধব নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করল।
মালতির উরুদ্বয়ের ঠিক মাঝখানে এসে থেমে গেছে শাড়ীর প্রান্ত। গোলাপী আভাযুক্ত দুই ভুরুর উপরে টকটকে লাল পাড় যেন স্বর্গের সুষমা মেলে ধরেছে উদ্ধব দাসের সামনে।
আর একটু—
আর সামান্য অগ্রসর হতে পারলেই উদ্ধব দাসের কাজ শেষ হয়ে যাবে।
মালতি এখনো অঘোরে ঘুমাচ্ছে।
ভারী নিঃশ্বাস পড়ছে।
মালতির ছোট ছোট দুটো বুক ওঠা নামা করছে নিঃশ্বাসের উত্থান ও পতনের সাথে সাথে।
উত্তেজনায় কাঁপছে উদ্ধব দাস। প্রতি রাতে এমনি করে কাঁপন ধরে উদ্ধব দাসের শরীরে।

উদ্ধব দাসের হাতের স্পর্শে এক সময় মালতির উরুর শাড়ীর পাড় প্রান্তদেশের কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

হঠাৎ যেন ভয়ানক চমকে উঠলো উদ্ধব দাস।

সে কি ভুল দেখছে!

হাতের প্রদীপের সলতেটা যতদূর সম্ভব উস্কে দিয়ে উদ্ধব দাস ঝুঁকে পড়ল মালতির দুই জঙ্ঘার মিলনস্থানের উপর।

না ভুল নয়।

এ ভুল হবার নয়!

ওর হাতের প্রদীপটা মেঝেয় নামিয়ে রেখে দুই হাতের পিঠে চোখ দুটো কচলে নিয়ে আবার চাইলো।

এ ভুল নয়!

এ সত্যি!

কোন রকমের দৃষ্টিবিভ্রম নয়।

তবে কি এতো দিন পরে আজ সত্যি সত্যিই উদ্ধব দাসের আশা পূর্ণ হতে চলেছে।

এতদিন পরে ঠাকুর যে তাকে কৃপা করছেন!

আবার তাকাল উদ্ধব দাস। আবার তাকাল।

একটা লাল রক্তের ধারা নেমে এসেছে মালতির উরু বেয়ে।

ডান হাতের তর্জনী দিয়ে খানিকটা রক্ত তুলে নিল উদ্ধব দাস।

একেবারে লাল রক্ত।

এই রক্তের ধারার জন্যে কত রাত জেগে কাটিয়েছে উদ্ধব দাস তার কোন লেখাজোখা নেই।

এতদিন পরে আজ ঠাকুর প্রসন্ন হয়েছেন।

ঠাকুর, ঠাকুর।

উত্তেজনায় শরীরটা যেন তোলপাড় করছে। স্থির হয়ে থাকতে পারছে না উদ্ধব দাস। কিন্তু এবার পালাতে হবে। মালতিকে কোন-রকমেই জানতে দেওয়া হবে না তার দেহে কি পরিবর্তন এসেছে।

কাঁপা হাতেই শাড়ীর প্রান্তটা মালতির হাঁটু পর্যন্ত টেনে দিয়ে উদ্ধব দাস কোনরকমে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

এখন তার অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব।

বাইরে ঝিরঝিরে বাতাস।

অন্ধকার যেন পাতলা হয়ে এসেছে।

আশ্রম ঘুমে অচেতন! ওপাশে হরিদাসীর ঘরের আলোও কখন নিভে গেছে।

আজকের রাতটুকুর জন্যে এখানে আশ্রয় পাওয়া যাবে?

উদ্ধব দাস চোখ টেনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

যুবক সংকুচিত হল উদ্ধব দাসের সন্ধানী দৃষ্টির সামনে।

উদ্ধব দাস তখন মন্দিরের আরতি শেষ করে এসে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে চৈতন্য চরিতামৃত নিয়ে বসেছেন। মাধব দাস হাত জোড় করে এসে বলল।

এই ছেলেটি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে।

উদ্ধব দাস চোখ মেলল।

প্রদীপের আলোয় ঠিক দেখা যাচ্ছে না। তবু বুঝতে অসুবিধা হয় না ছেলেটা পথের পরিশ্রমে ক্লান্ত। ক্লান্ত দেহ ক্লান্ত মন নিয়ে বছর বিশের এক যুবক মাধব দাসের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ছেলেটা আশ্রয় চাইছে।

ঠাকুর?

মাধব দাস উদ্ধব দাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল।

বাইরে উঠোন জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে। উদ্ধব দাসের দৃষ্টি এখন ওদের অতিক্রম করে জ্যোৎস্নাস্নাত উঠোনে গিয়ে পড়েছে!

উদ্ধব দাস দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলেন ঘরের মধ্যে। আবার চাইলেন ছেলেটার দিকে। ছেলেটার অঙ্গে অতি সাধারণ একখানা ধুতি ও

পাঞ্জাবী। কাঁধে রয়েছে কাপড়ের ঝোলানো ব্যাগ। ওর চেহারার মধ্যে প্রাচুর্যের জৌলুষ না থাকলেও আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে।
ধীরে ধীরে উদ্ধব দাস বলল—
তুমি তো বৈষ্ণব নও। এটা বৈষ্ণবের আখড়া। এ আখড়ায় বৈষ্ণবের অধিকার আছে। কিন্তু যারা বৈষ্ণব নয় তাদের এ আখড়ায় রাত্রিবাস করতে দেওয়া হয় না। যুবকের মুখখানা পাংশু হয়ে গেল। সে ধীরে ধীরে বলল—
আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি জানতাম না আপনার আখড়ায় বৈষ্ণব ছাড়া অপরের কোন স্থান নেই। তাহলে আপনাকে বিব্রত করতে আসতাম না। আচ্ছা আমি চলি। যুবক দুই হাত তুলে উদ্ধব দাসকে নমস্কার করে বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।
দাঁড়ান।
যুবক দাঁড়িয়ে পড়ল।
শুধু যুবক নয় উদ্ধব দাস এবং সেই সাথে উদ্ধব দাসও বিস্মৃত হয়েছে। মালতি পিছনের দরজা দিয়ে তখন ঘরের মধ্যে এসেছে কেউ টের পায়নি। এ কণ্ঠ মালতির।
আমাকে কিছু বলবেন?
যুবক চোখ তুললো।
কণ্ঠস্বরের মালিক এবার একটি ফুটফুটে মেয়ে। সেই প্রশ্ন করল—
এখান থেকে কোথায় যাবেন?
মালতি এবার উদ্ধব দাসের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।
জানি না।
মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল যুবক।
কোথায় যাবেন তা আপনি জানেন না?
না।
আজকের রাতটা কোথায় কাটাবেন?
তাও জানি না।

কোথায় থাকেন আপনি ?

মালতি এবার উদ্ধব দাসকে অতিক্রম করে যুবকের সামনে এসে দাঁড়াল।

বছর দুয়েক পথে পথে ঘুরছি। পথই আমার বর্তমানের ঠিকানা।

দু'বছর আগে কোথায় থাকতেন ?

হঠাৎ যুবক যেন কেমন শক্ত হয়ে গেল। ওর কোমল মুখখানা যেন অত্যন্ত কঠোর হয়ে উঠলো। সে বলল—

আমি অতীতকে ভুলতে চাই। অতীতের কোন প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো না। আমি চলি।

যুবক যাবার জন্যে পা বাড়াল।

কিন্তু আজ তো এখান থেকে আপনার যাওয়া হবে না।

যুবকের মুখের কাঠিন্য দূর হয়ে গেল। সে উদ্ধব দাসকে দেখিয়ে বলল—

কিন্তু আমি তো বৈষ্ণব নই। উনি বলছেন বৈষ্ণব ছাড়া এ আখড়ায় আর কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না।

বৈষ্ণব যেমন মানুষ আপনিও তেমনি মানুষ। এ আখড়া মানুষের জন্যে। আপনি থাকবেন এখানে।

মালতি উদ্ধব দাসের দিকে ফিরে বলল—

ওর থাকবার ব্যবস্থা করে দিন।

মালতি !

উদ্ধব দাস বাধা দেবার চেষ্টা করল।

মালতি কোন কথা শুনবে না ঠাকুর।

আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ হবে।

আজ থেকে আশ্রমের নতুন নিয়ম হবে। আর যদি নতুন নিয়ম করতে না পারেন আজকের রাতটাই হবে এই আশ্রমে মালতির শেষ রাত।

উদ্ধব দাস নিজেকে অসহায় বোধ করলো।

আখড়ার প্রধান হিসাবে নিয়ম ভঙ্গের অধিকার তার আছে, কিন্তু

সামান্য কারণে নিয়ম ভঙ্গ করতে ভয় পায় উদ্ধব দাস। আবার মালতিকেও সে চটাতে চায় না।
কি ঠাকুর, এর ভেতরে থাকার ব্যবস্থা করবেন, না আমি বাইরে বেরিয়ে যাবো ?
আমি চলি। আমার জন্যে আপনাদের এই ঝগড়া। আমি চলে গেলেই সব মিটে যাবে। কথাগুলো বিনীতভাবে মালতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করল যুবক।
না।
প্রায় চীৎকার করে উঠল মালতি।
আপনার যাওয়া চলবে না। যদি আপনি যান আমিও চলে যাবো।
কই, বল ঠাকুর ?
মালতি উদ্ধব দাসের সামনে এগিয়ে গেল।
উদ্ধব দাস বিপন্ন।
সে একবার মালতির দিকে তাকাল আর একবার চাইল ছেলেটার দিকে।
ঠাকুর, মালতি যখন জেদ ধরেছে নিজের জেদ সে বজায় রাখবেই। আপনি ওকে আখড়ায় থাকার অনুমতি দিন।
মাধব দাস নিজেও অনুরোধ করল।
বেশ।
একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল উদ্ধব দাস। তারপর চৈতন্য চরিতামৃত ওল্টাতে ওল্টাতে বলল—তোমরা সবাই যখন চাইছো তখন হোক আখড়ার নিয়ম ভঙ্গ। যুবকের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা কর !
মালতি এবার এগিয়ে গেল যুবকের কাছে। ডান হাত দিয়ে একটা হাত ধরে বলল—
এসো আমার সাথে !
মাধব দাস, আজ রাত্রে কেউ যেন আমাকে বিরক্ত করতে না আসে। আজ সারারাত ধরে আমি পাঠ করব।

পাঠে মনোযোগ দিল উদ্ধব দাস।

মাধব দাস প্রস্থান করল।

আশ্রমের পূর্বদিকে অতিথিশালার পাশে চারচালা ঘর আছে। ঘরখানা অধিকাংশ সময়েই বন্ধ থাকে। আখড়ায় বিশেষ কোন অতিথি এলে অথবা উৎসবের ব্যবস্থা হলে ঘরখানা খোলা হয়।

যুবককে সেই ঘরে নিয়ে এলো মালতি।

দাঁড়াও আমি ছুটে গিয়ে প্রদীপ নিয়ে আসি।

ঘরের বন্ধ দরজার সামনে যুবককে দাঁড় করিয়ে রেখে মালতি ছুটল প্রদীপ আনতে। যুবক খুবই বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল মালতির চলে যাওয়ার পথের দিকে।

কে এই মেয়ে! কি এর পরিচয়! স্বয়ং আখড়ার প্রধানও একে ভয় করে?

মালতি ফিরে এলো মিনিট দু'য়েকের মধ্যেই।

প্রদীপ হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো মালতি।

কি নাম গো তোমার? মালতি আপনি থেকে তুমিতে নেমেছে।

আমার নাম?

তবে কি আমি আমার এই হাতের প্রদীপটাকে জিজ্ঞাসা করছি!

আমি বুঝতে পারিনি।

তবে নাম বলে ফেলো।

আমার নাম ইন্দ্রনীল।

বাঃ ভারী সুন্দর নাম তো?

হঠাৎ যুবকের দিকে ঘুরে দাঁড়াল মালতি।

সঙ্গে তো বিছানা নেই, আমাদের বিছানায় শোবে তো?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল যুবক।

ঘরের এক কোণে একটা কাঠের সিন্দুকের উপরে বিছানা ছিল। সেগুলো পেড়ে আনলো মালতি।

এখান থেকে কোথায় যাবে? সত্যিই কি তুমি জানো না?

জানি না।

সে কি!

মুখ তুললো মালতি। ওর ডাগর দুটি চোখ আরো যেন বড় হল।

সত্যি করে বলছি কোথায় যাবো এখনো কিছু ঠিক করিনি।

বুঝেছি।

বিজ্ঞের মত মাথা ঝাঁকাল মালতি।

কি বুঝলে?

বলব না।

মালতি বিছানা পেতে চাদরটা ঠিক করে দিতে লাগলো।

দ্বিতীয়বার এ মেয়েকে অনুরোধ করা চলে কিনা যুবক ভেবে পায় না। খুব সাধারণ মেয়ে এ নয়। আখড়ার মহারাজ নিজে এর কথা মেনে চলে। এ মেয়ে যদি বেঁকে বসে তবে আজকের রাতটাও পথে পথেই কাটবে। শরীর ভয়ানক ক্লান্ত। সে অবস্থায় অত্যন্ত কষ্টকর হবে।

চুপ করে রইল যুবক।

এবার বোসো।

যুবক বসতে পারলে বাঁচে। কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে নিজেকে ছেড়ে দিল বিছানায়।

ব্যাগটা রাখার জায়গা ওটা নয়।

মালতি নিজেই ব্যাগটা তুলে নিয়ে দেয়ালের পেরেকে টাঙ্গিয়ে দিল। তারপর যুবকের সামনে ফিরে এসে বিছানাতেই বসে পড়ল।

কি আছে তোমার ব্যাগে?

ছবি আঁকার রং তুলি আর কাগজ।

তুমি ছবি আঁকো?

আঁকি।

মিনিট খানেক চুপ করে কী যেন ভাবলো মালতি। তারপর যুবকের উদ্দেশ্যে বলল তুমি আমার ছবি আঁকবে?

যুবক তাকালো মালতির মুখের দিকে।

শ্যামলা মেয়েটার মুখখানা অসাধারণ না হলেও মন কেড়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট সুন্দর। তাছাড়া মুখের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে আলগা একটা শ্রী। ছবি আঁকার একটা লোভ উঁকি মারতে শুরু করল যুবকের মনের মধ্যে। তবু ও বলতে বাধ্য হল—

আমি যে কাল সকালে উঠে চলে যাবো !

কি বললে ?

আমাকে যে কাল সকালেই চলে যেতে হবে।

কাল তোমার যাওয়া চলবে না।

কেন ?

আমার ছবি আঁকবে তুমি কাল সারাদিন ধরে। বল আঁকবে ?

যুবক মালতির দিকেই চেয়ে ছিল। ত্ব'জনের দৃষ্টি বিনিময় হতে ত্ব'জনেই চোখ নামিয়ে নিল।

বল কাল যাবে না ?

যুবক কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

কই বল ?

বেশ তাই হবে।

এবার মালতির চোখ ত্বটো খুশীতে যেন ঝলমল করে উঠলো।

তাহলে কাল আমার ছবি আঁকবে ?

আঁকবো।

তুমি পরিশ্রান্ত, ঘুমাও তুমি। আমি চলি।

যুবক কোন উত্তর দিল না।

মালতি ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মালতির চলে যাওয়া পথের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে যুবক তারপর উঠে এসে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিল। মালতি ঘিয়ের প্রদীপটা রেখে গেছে।

ঘিয়ের প্রদীপটার দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক কথাই মনে পড়ল যুবকের আর বারবার ঘুরে ফিরে মনে পড়তে লাগলো মালতির কথা।

এমন একটা মেয়ে সে যদি আগে খুঁজে পেত তাহলে পথকে আজ ঘর করতে হত না। জীবনের দুটো বছর কাটাতে হতনা পথে পথে !
প্রদীপের শিখাটা দুলে উঠলো
বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।
উঠে পড়ল যুবক।
দুটো সুন্দর চোখ ওর চোখের সামনে যেন জ্বল জ্বল করছে।
সে চোখে বেদনা রয়েছে, অশ্রু রয়েছে আবার অশ্রুর পাশাপাশি আগুনও রয়েছে।
হাত বাড়িয়ে ঝোলাটা পেড়ে নিল যুবক। ঝোলার মধ্যে থেকে বের করল তার ছবি আঁকার সরঞ্জাম।

সারারাত ছটফট করে একেবারে ভোররাত্রের দিকে ঘুম এসেছিল মালতির দু'চোখে। যখন ঘুম ভাঙ্গলো রোদ উঠেছে।
জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে লজ্জিত হল মালতি।
সবাই কি ভাবছে কে জানে !
তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল মালতি। অনেক কাজ তার।
উঠোন পরিষ্কার করা, গোবর লেপা, আলপনা আঁকা।
আঁচলটা ভাল করে গায়ে ও কোমড়ে জড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই উদ্ধব দাসের সাথে দেখা।
আশ্রমের অনেক নিয়মই ভাঙ্গছে মালতি।
মালতি উদ্ধব দাসের মুখের দিকে তাকাল স্বভাব সিদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সাহায্যে। দেখতে চেষ্টা করল উদ্ধব দাসের চোখের কোণে ব্যঙ্গ অথবা ক্রোধ।
না, ক্রোধ নয় ব্যঙ্গেরই আভাষ পাচ্ছে উদ্ধব দাসের চোখে।
হরিদাসীর ঘরের দরজা খোলা রয়েছে। হরিদাসীর অভ্যাস আছে খুব সকালে উঠে মায়ের দিকে বেড়াতে যাওয়া। আশ্রমে আসা

অবধি এই নিয়মের ব্যতিক্রম কোনদিন প্রত্যক্ষ করেননি মালতি। বাইরে কোথাও গেলে ঘরের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে যাওয়া অভ্যাস। ঘর যখন খোলা হরিদাসী নিশ্চয় তার প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফিরে এসেছে।

মালতি আকাশে সূর্যের দিকে তাকাল।

সূর্য বেশ খানিকটা উঠে এসেছে।

অন্য সময় হলে মালতি আচ্ছা করে দু'কথা শুনিয়ে দিত উদ্ধব দাসকে; বেলা হয়ে গেছে তাই ওকে পাশ কাটিয়ে গোয়াল ঘরের দিকে চলে গেল।

বালতির জলের মধ্যে গোবর আর মাটি গুলে তাই দিয়ে ঝাঁটার সাহায্যে সমস্ত উঠোন লেপে তাতে আলপনা এঁকে মালতি যখন হাত ধুয়ে উঠলো তখন রীতিমত হাপাচ্ছে। উদ্ধব দাস ততক্ষণে মন্দিরে ঢুকেছে।

হরিদাসী তার ঘরে দরজা দিয়েছে, আশ্রববাসীরা ভিক্ষেয় বেরিয়েছে। এবার মালতির কাজ হেঁসেলে।

আখড়ার বিশজন মানুষের দু'বেলা সেবার সমস্ত কাজই মালতিকে করতে হয়। এইতো একবছর আগেও এসব ছিল হরিদাসীর এক্তিয়ারে। বছর খানেক হল এসবের সমস্ত ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে মালতি।

আজ কিন্তু কোন কাজেই মালতির ক্লান্তি লাগছেনা।

নতুন অতিথি আর কতক্ষণ ঘুমাবে।

দরজা এখনো ভেজানো।

কাজের ফাঁকে মালতির বার বার মনে হয়েছে ওঘরে যায়, ওকে ঘুম থেকে টেনে তোলে, কিন্তু পারেনি। উদ্ধব দাসের চিন্তা তাকে বাধা দিয়েছে।

রান্নার ফাঁকে ফাঁকে মনের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা উঁকি মারে।

জ্বরজারি হল না তো?

ক্রমে বেলা প্রায় দশটা বাজলো। তখনো ঘরের দরজা বন্ধ দেখে বিস্মিত হল মালতি।
আর স্থির থাকতে পারলো না সে।
পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।
বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটু দ্বিধা এলো। কিন্তু সেই দ্বিধাকে প্রশ্রয় দিল না মালতি। দরজা খুলে ফেলল।
কিন্তু একি !
ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল মালতি।
ওর বুকের ভেতরটা যেন কেমন করছে।
ঘরে কেউ নেই।
তবে কি সে চলে গেছে !
মালতি ঘরের চার দিকে চাইলো।
যেখানে যুবকের ঝোলাটা ছিল, নেই।
মালতি ভাবতেও পারে নি, ছেলেটা তাকে কিছু না বলে চলে যাবে।
বেইমান বেইমান—
আপন মনে বিড়বিড় করে উঠলো মালতি।
বলে গেলে কি মালতি তাকে বাধা দিতো ? চলেই যদি যাবে, কি ক্ষতি হত বলে গেলে ? মানুষ নামক জীবগুলো ক্রমেই বিশ্বাস হারাচ্ছে মালতির কাছে। কি দরকার ছিল ছবি আঁকার কথা বলার। ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে মালতির চোখে পড়ল ঘরের কোণে জড়ো করে রাখা বিছানার ধারে কি যেন একটা রয়েছে।
এ ঘরের কুটোটার সাথেও মালতি পরিচিত। অপরিচিত জিনিষটা কি, দেখার জন্য এগিয়ে গেল মালতি।
সামনে গিয়ে চমকে উঠল !
এ ছবি এলো কোথেকে ?
এ যে তার নিজের ছবি। কে বলবে এ মালতি নয়।
কখন আঁকলো।

মালতি ছবিখানা তুলে নিয়ে বুকের উপর চেপে ধরল।

তাকে না বলে ও কেন চলে গেল ?

কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় ভেতর থেকে।

ছবিখানা বুকের উপর থেকে নামিয়ে দিয়ে ডান হাতে নিতে গিয়েই মালতির চোখে পড়ল কি যেন লেখা রয়েছে ছবির উল্টো পিঠে।

মেলে ধরল চোখের সামনে।

ছোট্ট একটা চিঠি। তাতেই লেখা—

মালতি, তোমার ছবি রইল। কাল সারা রাত ধরে এঁকেছি। কথা দিয়েছিলাম, কথা রেখেছি। সকালে উঠে চলে গেলাম। যেতে মন চাইছিল না। ইচ্ছে হচ্ছিল তোমার সাথে দেখা করে যাই। দরজা পর্যন্ত গেলামও। কিন্তু দেখা হল না। তোমার ঘরের দরজা তখনো খোলোনি। আমি পথের মানুষ। ঘর আমার জন্যে নয়। তাই চলে গেলাম. যদি মন চায় আবার আসবো। হয়তো আজকেও চলে আসতে পারি। ইতি—ইন্দ্রনীল।

কোনরকমে চিঠিখানা শেষ করে মালতি।

তার আগেই ওর চোখের কোণে জল জমেছে

মালতির ইচ্ছে হল ও চীৎকার করে ওঠে—

ওগো তুমি এসো, অমন করে দেখা না করে চলে যেও না।

মলতি চীৎকার করতে পারলো না। শুধু ওর বুকের এক অজ্ঞাত কোণ থেকে একটা ব্যথা পাক খেয়ে উপরে উঠে আসতে লাগল।

ছবিখানা আঁচলের তলায় বেঁধে মালতি ছুটে পালিয়ে গেল ওর নিজের ঘরে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবার চিঠিখানা পড়ল। আবার আবার পড়ল চিঠিখানা। বারবার পড়তে ইচ্ছে করছে। তবু সাধ মিটছে না।

লিখেছে ইচ্ছে হলে সন্ধ্যের দিকে আসবে—

মালতি এবার ঠাকুরের ছবির কাছে এগিয়ে গেল।

ছবিটা আশ্চর্য রকমের জীবন্ত। অনেক খুঁজে খুঁজে এ-ছবি জোগাড়

করে এনেছে উদ্ধব দাস।
ছবির কাছে হাত জোড় করে দাঁড়াল মালতি।
ঠাকুর, ও যেন আজ সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসে।
ভক্তিভরে প্রণাম করল প্রার্থণা শেষে।
এরপর শুরু হল অপেক্ষা করার পালা।
মালতির দেহের অণু পরমাণু শুধু অপেক্ষা করছে আজ সন্ধ্যেয় ইন্দ্রনীল ফিরে আসুক।
সময় এগিয়ে চলে।
কিছুই ভাল লাগে না মালতির।
প্রতি কাজে দেখা দেয় অবহেলা আর বিরক্তি।
উদ্ধব দাস অবাক হয়। মালতির আশ্রম জীবনে এ ঘটনা এর আগে আর কখনো ঘটে নি।
হারিদাসী এগিয়ে আসে।
বাধা দেয় মালতী।
দিন গড়িয়ে চলে সন্ধ্যের দিকে।
মালতির দৃষ্টি একবার যুবকের ঘরের দিকে আবার পরক্ষণেই পথের দিকে ছুটে যায়।
মালতির মন বলছে ও ফিরে আসবেই।
দুপুরের দিকে সকলে যখন বিশ্রাম নেয় মালতি তার কবিতার খাতা খুলে বসে।
মালতি কবিতা লেখে।
আজ কবিতা লেখাতেও মালতির মন নেই। দুপুরবেলায় খাতা নিয়ে বসেছিল খোলা জানালার পাশে। একছত্রও লিখতে পারেনি।
এলো বিকেল।
পুকুরে গিয়ে গা ধোবার কথা ভুলে যায়।
সন্ধ্যের কিছু আগে হারিদাসী এসে হাত ধরল মালতির।
কিরে, আজ কি পূজার কথাও ভুলবি ?

লজ্জিত হল মালতি।

ও বিকেলে স্নান সেরে ফুল তুলে আনে। সেই ফুলে দেবতার পূজা ও আরতি হয়।

কি হয়েছে বলতো মালতি ?

হরিদাসী মালতির একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল।

হরিদাসীর উপরে মালতির কখনো কখনো প্রচণ্ড রাগ হয়। তবু এই হরিদাসীর কাছেই মালতি তার মনের ঝাঁপি খুলে বসে।

ফিসফিসিয়ে হরিদাসী মালতির কানে কানে বলল—

ও ফিরে আসবে তো ?

কে ?

প্রশ্ন করার পরক্ষণেই হরিদাসী বুঝতে পারলো মালতি কার কথা বলছে।

মাত্র একদিনের মধ্যেই মরলি ?

মালতিকে কাছে টানলো হরিদাসী।

মালতি তাকাল যুবকের খালি করে যাওয়া ঘরের দিকে।

ওরা পথের মানুষ মালতি, ওরা কি বাঁধা থাকে ? এমন ভুল তুই কেন করলি ?

কি জানি !

মালতি তার দৃষ্টি অবনত করল।

পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বলল।

আমার মন বলছে ও আসবে। নিশ্চয় ফিরে আসবে।

যা, গা ধুয়ে পূজোর জোগার কর। উদ্ধব ঠাকুর এখনি ফিরে আসবে।

তাই যাই।

কলসী নিয়ে পুকুরের দিকে অগ্রসর হল মালতি।

পশ্চিম আকাশে একখণ্ড মেঘ আগুনের রঙে নিজেকে রাঙিয়েছে। নিজের মনের দিকে তাকাল মালতি। সেখানে একখণ্ড ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘের সন্ধান মিলল।

মালতি আবার তাকালো মেঘের দিকে। তার মনের মেঘটা কি আকাশের ঐ মেঘের মত রাঙা হবে না ?

ওকি সত্যি সত্যিই আসবে না ?

ক্রমে সন্ধ্যে নামলো। আলোর অস্তিত্ব মুছে দিয়ে নেমে আসতে লাগল অন্ধকার।

মালতির মনের মেঘটা যেন আরো কালো হয়ে উঠলো।

পুজোর সমস্ত জোগাড় করে দিয়ে নিজের ঘরে চলে এলো মালতি। আর একটু পরে আরতির ঘণ্টা বেজে উঠবে। তারপর আহারের পর্ব শুরু হবে।

তবে কি যুবক সত্যিসত্যিই আর আসবে না ?

যুবকের আঁকা ছবিখানা টিনের স্যুটকেস থেকে বের করে মেলে ধরল মালতি। যুবক এ ছবি তাকে সামনে বসিয়ে আঁকেনি। আগে নিজের মনের মধ্যে মালতির ছবি এঁকেছে, পরে সেই ছবি ট্রেস করেছে কাগজের উপরে।

মালতি নিজেকে প্রশ্ন করে—

মনের মধ্যে যাকে এমন করে স্থান দেওয়া যায় সত্যিই কি তাকে ভোলা সম্ভব ?

ও কি সত্যিই আর আসবে না ? কোনদিন আসবে না ?

একবার ছবির উল্টো পিঠের দিকে তাকাল।

যদি আবার মন হয় আসবো। হয়তো আজকেই আসতে পারি।

কলমের ডগায় বেশ জোর দিয়ে লেখা কটি কথা।

আরতির কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন আর্তনাদ করে উঠলো।

নিজের বুকের উপর হাত রাখলো মালতি।

কেন এমন হল ? এক রাতের ক্ষণিকের দেখা যুবকের জন্যে কেন সে এতো উতলা হল ?

নানান চিন্তা করতে করতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল মালতি। ওর ঘুম ভাঙ্গলো হরিদাসীর ডাকে।

চোখ মেলে তাকাতেই হরিদাসী ফিসফিস করে বলল—

ও এসেছিল।

কে ?

কে আবার, সারা দিন যার কথা ভেবে কাটালি ?

এসেছিল ?

বিছানায় উঠে বসল মালতি।

এখন কোথায় ?

গোঁসাই ওকে ঢুকতে দেয়নি।

কি বললে ? গোঁসাই ঢুকতে দেয়নি ?

মালতি যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো।

গোঁসাই ওকে বের করে দিয়েছে !

কেন ?

গোঁসাই যখন ওকে আখড়া থেকে বের করে দেয় তখন তুমি কোথায় ছিলে ?

আমি গোঁসাইয়ের কাছেই ছিলাম। গোঁসাইকে বার বার নিষেধ করেছিলাম, ওকে ফিরিয়ে দিও না। গোঁসাই শোনেনি আমার কথা।

তুমি আমাকে ডাক দিলে না কেন ?

গোঁসাই তখন অন্য মূর্তি ধারণ করেছে। আমার ভীষণ ভয় করছিল। গোঁসাইয়ের অমন ভয়ংকর রূপ আমি আর কোনদিন দেখিনি। তবু আমি গোঁসাইকে বাধা দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, ওকে ফিরিয়ে দিলে মালতি অনর্থ বাধাবে।

উঃ! কেন যে কাল রাতে অমন কালঘুমে আমাকে পেয়ে বসল কে জানে! আমি জেগে থাকলে ওকে আমি কিছুতেই যেতে দিতাম না হরিদাসী। আমি কিছুতেই যেতে দিতাম না। মালতির ডাগর দুটো চোখের কোণে জমা হয়েছে সমস্ত পাঁজর নিংড়ে বেরিয়ে আসা দুই ফোঁটা অশ্রু। দু'চোখ ভরা টলটলে দু'ফোঁটা জল নিয়ে মালতি হরিদাসীর কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলল—তুমি কেন ওকে

আটকে রাখলে না ? অন্তত আমি ঘুম থেকে না ওঠা পর্যন্ত তুমি আটকাতে পারলে না ?

দৃষ্টি অবনত করল হরিদাসী।

যাবার সময় কি বলে গেল ? ও কি একবারও আমার কথা বলেছিল ?

একটা কথাও বলেনি। শুধু চলে যাবার সময় কাতর দুটো চোখ তুলে তোর ঘরের দিকে চেয়েছিল।

তারপর হরিদাসী ?

তারপর ?

হ্যাঁ !

হয়তো মিনিটখানেক দেরী হয়েছিল আখড়া ছেড়ে চলে যেতে। সেই এক মিনিট সময়ও গোঁসাই ছেলেটাকে দিতে চায়নি। তাড়া দিয়ে উঠেছিল। ছেলেটা করুণ চোখে আর একবার তোর ঘরের দিকে চেয়ে উস্কোখুস্কো চুলগুলোকে ডান হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে পিছনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

হরিদাসী, ও যেখানেই যাক, আমি ওকে—আমি ওকে খুঁজে বের করবই। আমি ওকে আসতে বলেছিলাম, তাই ও এসেছিল। উদ্ধব দাস ওকে অন্যায় ভাবে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি ওকে সারাদিন ধরে খুঁজে বের করব তারপর আমাদের অন্যায়ের প্রতিকার করব।

মালতি !

কি ?

ওরা পথের মানুষ। পথই ওদের ঘর। ওদের ঘরের লোভ দেখিয়ে কোন লাভই হয় না। কারণ ঘর ওরা কোনদিনই বাঁধে না।

কিন্তু আমি যে ওর দুই চোখে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিলাম।

ও তোর দেখার ভুল। তোর ভুল একদিন ভাঙ্গবে মালতি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হরিদাসী মালতিকে নিজের বুকের উপর চেপে ধরল। সেই অবস্থাতেই মালতি বলল—

তুমি দেখে নিও হরিদাসী ও যেখানেই থাক আবার একদিন ও

ফিরে আসবেই। আমার সাথে দেখা করার জন্যে একদিন এই আখড়ায় আবার ওকে আসতেই হবে।

হরিদাসীর ইচ্ছে হল ওকে বলে দেয় ওরা আর কোন দিন ফিরে আসে না। দীর্ঘদিন আগে এই আখড়া থেকে এক তরুণও অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। সেও আর কোনদিন ফিরে আসেনি।

কিন্তু বলতে পারলম না সে-কথা। বলল—

আমি যাই মালতি। আশ্রমের অনেক কাজ বাকী তুইও যা। কাজগুলো সেরে নে।

হারিদাসী নিজের ঘরে চলে এলো।

অনেক দিনের একটা পুরোনো কথা আজ আবার মনে পড়ে গেছে। বুকের ভেতরটা কেমন যেন তোলপাড় করছে। একটা হাহাকার মনের কোন অজ্ঞাত স্থান থেকে জোর করে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এমন হয় হরিদাসীর। জোর করে ভুলে থাকা কথাগুলো যখন হঠাৎ মনে পড়ে যায়, বুকের ভেতরটা এমনি হাহাকার করে ওঠে। তখন শরীরটা অত্যন্ত অস্থির লাগে।

মালার থলেটা কুলুঙ্গি থেকে পাড়তে গেল হরিদাসী। পারল না। হাতটা দারুণ কাঁপছে। মালার থলেটা কুলঙ্গিতেই রইল। হরিদাসী এসে বসল শ্রীকৃষ্ণের ছবির সামনে। মনে মনে বলল, আমার মনটাকে শান্ত করে দাও ঠাকুর। শান্ত করে দাও। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

বাইরে থেকে একটা গোঁ গোঁ শব্দ ভেসে আসছে। গ্রামের শেষ প্রান্তে কংসাবতীর বুক ফেঁপে ফুলে উঠেছে। ভরা বুক নিয়ে কংসাবতী ফুঁসছে! তারই শব্দ আসছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো হরিদাসীর বুক খালি করে।

সেদিন রাত্রেও এমনি করে ফুঁসছিল কংসাবতী। বিকেল থেকেই কংসাবতী ফুলে উঠছিল। অপর্ণা বলে একটি মেয়ে মাসীর বাড়ী মেদিনীপুরে এসেছিল বেড়াতে। সঙ্গে এসেছিল অসিত। অসিত

দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

সেদিন অপরাহ্নে অসিতকে নিয়ে অপর্ণা বেরিয়েছিল কংসাবতী দেখতে।

সেদিন অপরাহ্নে কংসাবতীর রূপ যেন ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। কংসাবতীর সর্বনাশা রূপ দেখতে দেখতে অসিতকে নিয়ে বাঁধের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছিল। কত দূর ওরা চলে এসেছিল সে খেয়াল ছিল না কারো। কংসাবতীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে ওরা হারিয়ে ফেলেছিল সময়ের হিসেব। অলক্ষ্যে কখন আকাশে মেঘ জড়ো হয়েছে, কখন সূর্য ডুব দেবার জন্যে নেমে এসেছে ওরা টের পায়নি। যৌবন টলমল কংসাবতীর রূপ দেখতে দেখতে দুই তরুণ তরুণী ঘরে ফেরার কথা ভুলে গিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল কালো কালো মেঘ ওদের তাড়া করে আসছে।

ওরা যখন সম্বিত ফিরে পেল তখন আর ফেরার সময় নেই। ঝোড়ো বাতাস বইতে শুরু করেছে। বৃষ্টি এসেছে ঝুপঝুপ করে।

অপর্ণা অসিতকে জড়িয়ে ধরল।

আমরা আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলে ঝড় আমাদের তুলে নিয়ে গিয়ে ঐ কংসাবতীর মধ্যে ডুবিয়ে দেবে।

অসিত নিজেও বিচলিত হয়ে পড়েছে। বাতাসের প্রকোপ বাড়ছেই। এখানে থাকা সত্যিই বিপজ্জনক। বৃষ্টিতে সমস্ত শরীর ভিজে গেছে। এখানে থাকলে যেকোন সময় বিপদ আসতে পারে।

কিন্তু কোথায় যাই বলতো!

কতকটা অসহায়ভবে চারদিকে তাকাল অসিত।

কোথাও আমাদের আশ্রয় নিতেই হবে। রাত আসছে।

দক্ষিণ দিকে একটা আলো দেখতে পাচ্ছি অপর্ণা।

অপর্ণা সেদিকে তাকালো। ঝড়বৃষ্টির মাঝে সত্যিই একটা আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

চলো অসিত আমরা ওখানেই যাই।

তাই চলো।

ওরা দু'জনে বাঁধের উপর থেকে সে আলো লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করল।

অনেক দূরে আলো জ্বলছে। প্রতি পদে পদে বাধা। ঝড় বাধা দিচ্ছে। বৃষ্টি বাধা দিচ্ছে। অন্ধকার বাধা দিচ্ছে। তবুও ওরা ছুটছে। এই মুহূর্তেই একটা আশ্রয় ওদের চাই। ঝড়ের দাপট ক্রমেই বাড়ছে। বাতাসের গর্জনে কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম। অবশেষে ওরা একটা বাড়ীর সন্ধান পেল। বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে সরু একটা আলোর রেখা বাইরে এসে পড়েছে।

অসিত দরজার কড়া ধরে নাড়া দিল। একবার দুবার তিনবার। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এবার সত্যিকারের ভয় পেয়ে গেল দু'জনে। বাইরে ঝড়ের দাপট বেড়েই চলেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোয় অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ হচ্ছে বটে কিন্তু বিদ্যুৎতের আলো মিলিয়ে যেতেই সেই পাথরের মত জমাট বাঁধা অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে প্রকৃতি মাথা কুটছে ঝড়ের দাপটে।

অপর্ণা ভয়ে ভয়ে অসিতকে জিজ্ঞাসা করল, ঘরে লোক আছে তো?

নিশ্চয় আছে অপর্ণা। ঘরের মধ্যে আলো জ্বালিয়ে রেখে এমন ঝড়ের রাতে কোথায় যাবে?

দরজায় আর একবার ধাক্কা দিল অসিত।

বিদ্যুতের আলোয় ওরা দেখছে গ্রামের প্রান্তে এসে পড়েছে ওরা। এবারো যদি সাড়া না পাওয়া যায় অন্য কোথাও আশ্রয়ের সন্ধানে যেতে হবে।

ঠিক তখনই দরজা খুলে গেল।

হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল দু'জনে।

ঘরের মধ্যে দু'জন পুরুষ। একজন দরজা খুলে দিয়েছে। অন্যজন দুই হাতের আড়াল দিয়ে প্রদীপের শিখাটাকে বাঁচাতে ব্যস্ত।

ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ঘরের মাঝখানে মধ্যবয়সী এক বৈষ্ণব ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে পুঁথি পড়ছেন।

অসিত এগিয়ে গেল। দুই হাত জোড় করে বলল—আজ রাতের মত আমরা আশ্রয় চাই ঠাকুর। আমরা বিপন্ন।

অসিতের পাশে দাঁড়িয়ে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল অপর্ণা। ও ভাবতেও পারেনি, কোনদিন এমন করে একটা রাত্রের জন্যে তাকে আশ্রয় ভিক্ষে করতে হবে। তাও আবার এক সাধুর কাছে।

আশ্রয় পেল দু'জনে। ঠাকুর ওদের বিমুখ করলেন না। ঠাকুর ওদের জন্যে শুকনো বস্ত্রের ব্যবস্থা করলেন। রাত্রে জোর করে কিছু প্রসাদ গ্রহণ করতে বাধ্য করলেন।

তারপর গভীর রাত্রে ওদের শোবার ব্যবস্থাও হল। ঝড় তখনো সমানে চলছে। মাঝে মাঝে বুকের ভেতর পর্যন্ত চমকে দিয়ে বাজ পড়ছে কোথাও। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ওদের দু'জনের পৃথক ঘরে শোবার ব্যবস্থা হল।

অসিত আপত্তি করেছিল। কিন্তু তার আপত্তি টেকেনি। ঠাকুর বাধা দিয়ে বলেছিলেন, এটা আখড়ার রীতি। স্বামী-স্ত্রী ছাড়া এখানে ভাইবোনেরও একঘরে শোবার অনুমতি নেই।

অপর্ণা লজ্জায় কিছু বলতে পারেনি।

অপর্ণার শুকনো মুখ লক্ষ্য করে ঠাকুর বললেন—

ভয়কি ? তুমি পাশের ঘরেই থাকবে। যে-ঘরে কাপড় ছেড়ে এলে। এ-ঘরে আমি থাকবো কোন ভয় নেই। রাতে যখন যা প্রয়োজন হবে আমাকে ডাক দেবে। ভয়ে ভয়ে ঠাকুরের মুখের দিকে চাইলো অপর্ণা কিন্তু ভয় পাওয়ার সেখানে কিছুই নেই। আজন্ম ব্রহ্মচারী এক বৈষ্ণবের মুখ। সে মুখে মধুর হাসি লেগেই আছে,।

আমি আবার বলছি তোমার কোন ভয় নেই।

ঠাকুর মৃদু হাসলেন। মানুষ মুগ্ধ করা হাসি।

অপর্ণা এবার অসিতের দিকে ফিরলো।

অসিতও হাসলো। বলল—

ভয় কি অপর্ণা। একটা রাত ঠাকুরের আখড়ায় আমাদের নিরাপদেই কেটে যাবে। তারপর কাল ভোরে উঠেই বাড়ীর পথ ধরতে হবে।

এতক্ষণ উত্তেজনার মধ্যে বাড়ীর কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিল অপর্ণা। অসিতের কথায় মনে পড়ল বাড়ীর কথা। বাড়ীতে একটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। এই ঝড়ের মধ্যেও বাবা নিশ্চয় সবাইকে খুঁজতে পাঠিয়েছেন। তিনি নিজেও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারবেন না নিশ্চয়। এই জল ঝড়ের মধ্যে ভিজে বাবার আবার কোন অসুখ না হয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অপর্ণা।

বাড়ীর সবাই সারারাত দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটাবে। ওরা ভাবতেও পারবেন না, আমরা এতো দূরে চলে এসেছি। এক আখড়ায় রাত্রের মত আশ্রয় নিয়েছি। মায়ের চিন্তায় দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে যায়। মা নির্ঘাৎ ধরে নেবেন ওরা আর কোথাও যায়নি। ঝড়ের মধ্যে পথ ভুল করে কংসাবতীর বুকে গিয়ে ডুবেছে দু'জনে।

কই এসো ঠাকুর? রাত যে অনেক হল।

অসিতকে অন্য ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে উদ্ধব নামে ছেলেটি ছাতা হাতে এসে দাঁড়িয়েছে।

দেরী করে কোন লাভ হবে না ঠাকুর।

ঠাকুর হাসলেন। তেমনি মধুর হাসি।

আমি তাহলে চলি অপর্ণা?

অসিত এগিয়ে এসে অপর্ণার একখানা হাত চেপে ধরল।

অপর্ণা কি বলবে ভেবে পায় না। আশ্রমে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য সম্পর্কের পুরুষ ও নারীর এক ঘরে শোবার নিয়ম নেই। আশ্রম ওদের জন্যে নিয়মভঙ্গ করতে পারে না। এই ধরণের আশংকার কথা মনে এলে স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই ওরা পরিচয় দিত। সিন্দুরের প্রশ্ন

আসতো না নিশ্চয় এই জল ঝড়ের রাতে। আসল পরিচয়টা দেওয়াই ভুল হয়ে গেছে। এখন ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে অসিতকে অন্য ঘরে পাঠিয়ে অপরিচিত এক আখড়ায় একা একা রাত কাটিয়ে।

কই তুমি তো কিছু বলছো না অপর্ণা।

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে অপর্ণা অসিতের দিকে চাইল। আশ্রমের কাপড়ে ওকে ভারী সুন্দর লাগছে দেখতে।

ধীরে ধীরে অপর্ণা বলল—

আখড়ার নিয়ম যখন ভাঙ্গতে পারা যাবে না তখন তো তোমাকে অন্য ঘরে যেতেই হবে।

তাহলে চলি?

যাবার সময় অসিত হাসলো। অপর্ণার চোখে সে হাসি বড্ড করুণ মনে হল। তবু ওকে বলতেই হল, এসো।

অসিত চলে গেল:

এবার তুমি যাও। রাত হয়েছে। আমি আরো কিছুক্ষণ পাঠ করব।

অগত্যা অপর্ণা পাশের ঘরে চলে এলো।

ঘরের এক কোণে ছোট্ট একটা প্রদীপ জ্বলছে। ছোট্ট একটা বিছানা আগেই পেতে দিয়ে গেছে সেই ছেলেটা। উদ্ধব দাস না কি নাম। এই ঘরেই ওকে রাত কাটাতে হবে।

ছোট্ট শয্যায় এসে আশ্রয় নিল অপর্ণা। দেহ মন দুটোই তার ক্লান্ত। চোখের পাতায় ঘুম নেমে আসছে। আজ অপরাহ্নে বাড়ি থেকে বেড়াতে বেড়োবার সময় ঘুণাক্ষরেও কি জানতে পেরেছিল আজকের রাতটা তাকে এখানে নিঃসঙ্গ কাটাতে হবে?

ওঘরে ঠাকুর এখনো পাঠ করে চলেছে। দুই ঘরের মাঝের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছে অপর্ণা। তবু একফালি আলো আসছে দরজার ফাঁক দিয়ে। কাঁপা কাঁপা এক ফালি আলো।

বাইরের ঝড় তেমনি, বইরে বজ্র পড়ছে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি হচ্ছে। ঘুমমাখা চোখে অপর্ণার মনে হয় এ ঝড় বুঝি অনন্তকাল ধরে চলবে। এ ঝড় বুঝি শেষ হতে জানে না। এক সময় ঘুম নেমে এলো অপর্ণার দু'চোখে।

ঘুম ভাঙ্গলও একসময়।

একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখছে অপর্ণা। ঝড়েরই স্বপ্ন। ঝড়ের মধ্যে দিশেহারা হয়ে দু'জনে ছুটোছুটি করছে। কোথাও কোন আশ্রয়স্থলের চিহ্নও নেই। এক এক সময় মনে হচ্ছে ঝড় বুঝি ওদের দু'জনকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে ঐ কংসাবতীর ঘূর্ণিপাকে। দু'জনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ঝড় তেড়ে আসছে। অপর্ণা জড়িয়ে ধরল অসিতকে। অসিতও ওকে শক্ত বাহুর সাহায্যে চেপে ধরল। কিন্তু ওকে ধরে রাখতে পারলো না অসিত। ঝড় ওকে তুলে নিয়ে ফেলে দিল কংসাবতীর বুকে।

অসিত?

আর্তনাদ করে উঠলো অপর্ণা।

অসিতকে দেখতে পাচ্ছে না অপর্ণা অন্ধকারের মধ্যে, অসিত কোথায় হারিয়ে গেছে। আর অপর্ণা কংসাবতীর ঘূর্ণীর মধ্যে পড়ে ডুবে যাচ্ছে! দম বন্ধ হয়ে আসছে অপর্ণার।

অসিত?

অপর্ণা প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করে অসিতকে ডাকতে গেল। কিন্তু পারলো না। গলা দিয়ে কোন স্বর বের হল না। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ডুবে যাচ্ছে অপর্ণা। কংসাবতীর ঘূর্ণীপাকে জলের তলায় চলে যাচ্ছে ও।

বাঁচাও।

আর একবার চীৎকার করতে গেল। কিন্তু এবারো তার কণ্ঠ রুদ্ধ। কোন স্বর বের হল না। অসিত কাছাকাছি কোথাও নেই।

ঘুম ভেঙ্গে গেল অপর্ণার।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু একি! বুকের উপর এতো ভার কিসের! অপর্ণা চীৎকার করতে গেল। কিন্তু পারল না। একখানা শক্ত হাত প্রচণ্ড শক্তিতে ওর গলা চেপে ধরল।

চুপ। একটা কথা বললে গলা টিপে একেবারে শেষ করে দেবো।

চুপ করে গেল অপর্ণা।

ও সব বুঝতে পারছে। এরপর চীৎকার করতে গেলে হাতখানা সত্যি সত্যিই ওকে চেপে একেবারে শেষ করে দেবে। ঘর অন্ধকার। ঘিয়ের ছোট্ট প্রদীপটা কখন নিভে গেছে। ঝর থেমেছে। মেঘের গর্জন থেমেছে···বৃষ্টিও থেমেছে। কিন্তু নতুন ঝড় শুরু হয়েছে অপর্ণার দেহ-মনে। একটা যন্ত্রণা ছুটোছুটি করছে দেহের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। অপর্ণা নিরুপায়। নিরুপায়ে মৃত্যুবরণ করছে অপর্ণা সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় অপরিচিত ঘরে অপরিচিত মানুষের হাতে।

কত রাত হবে কে জানে!

ঘর ছেড়ে চলে যাবার সময় লোকটা বলে গেল, এ-কথা প্রকাশ পেলে দু'জনকেই শেষ করে ফেলা হবে।

হরিদাসী হাসলো। অত্যন্ত করুণ সেই হাসি। নবনী দাস আজ আর পৃথিবীতে নেই। মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে ঠাকুর ওকে সরিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু উদ্ধব দাস আছে। নবনী দাসের নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত শিষ্য উদ্ধব দাস। নবনী দাসের সমস্ত ঘটনার সাক্ষী উদ্ধব দাস। উদ্ধব দাসকে হরিদাসীর চেয়ে ভাল করে এই আখড়ার, এই পৃথিবীর কেউ বুঝি চেনে না।

অপর্ণা কিকরে কেমন করে হরিদাসী হয়ে গেছে সেসব অনেক কথা। আবার হাসে হরিদাসী। নিজের ঘরে বসে আপন মনেই হাসে।

সে ভাল করেই জানে ইন্দ্রনীল আর কোনদিন এ অশ্রমে ফিরে

আসবে না। ও হারিয়ে গেছে এই পৃথিবী থেকে। সেদিন যেমন করে অসিত হারিয়ে গিয়েছিল।

হরিদাসী আবার ফিরে যায় তার সেই অতীতের ভয়ংকর দিনগুলোয়। ভোরবেলায় আবার এসেছিল সেই অন্ধকারের মানুষ। বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় তখন ছটফট করছে অপর্ণা। যন্ত্রণা তার দেহে, যন্ত্রণা তার মনে।

আবছা অন্ধকারের মধ্যে লোকটাকে আবার আসতে দেখে ভয়ানক চমকে উঠলো।

লোকটা আস্তে আস্তে এসে বসলো ওর পাশে।

আবার কি চায়? তার যথাসর্বস্বই তো লোকটা রাতের অন্ধকারে এসে লুট করে নিয়ে গেছে।

মুখ দিয়ে ভুর ভুর করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে।

কান্না পায় অপর্ণার। এই সেই সাধু! এই সেই ভেকধারী! একই মেয়েদের চোখ দিয়েও তো কাল রাত্রে ওকে সন্দেহ করতে পারেনি অপর্ণা।

এবার তুমি কি করবে? সকাল হয়ে আসছে।

আমি বাড়ী যাবো।

কলংকের কালো মসীতে অঙ্গ তোমার কালো হয়ে উঠেছে। বাড়ী গিয়ে ঐ কলংকিত অঙ্গ দেখাবে কি করে?

তবু আমি বাড়ী যাবো।

পাপ ঢুকেছে তোমার দেহে। এ পাপ যখন প্রকাশ পাবে তখন তুমি কি করবে? বাড়ীর সকলের মুখে তোমার ঐ কলংকের ছোপ লাগাতে চাও?

এবার সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণা কোন উত্তর দিতে পারল না।

তুমি ফিরে গেলে তোমাদের বংশ কলংকিত হবে।

লোকটা অপর্ণার আরো কাছে সরে এলো। একটা হাত রাখলো ওর বুকের উপরে।

হাতখানা সজোরে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল অপর্ণার কিন্তু পারলো না। ওর হাত দুটো অবশ হয়ে গেছে।

আমার একটা কথা শুনবে?

কি?

তুমি এই আখড়ায় থেকে যাও।

তা কি করে সম্ভব?

এই পৃথিবীতে সবই সম্ভব। তুমি আখড়ার সমস্ত ভার নিজের হাতে নিয়ে এখানে থাকবে।

তা হয় না।

কেন?

অসিত রয়েছে।

অসিত নেই।

সেকি! অপর্ণা উঠে বসল।

লোকটা হাসলো। হাসতে হাসতে চাপাকণ্ঠে বলল—

একটু আগেই আমি ওর ঘরে গিয়েছিলাম। ও পালিয়েছে।

মিথ্যে কথা। আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।

আমার কথা অবিশ্বাস হলে তুমি নিজে গিয়ে দেখে আসতে পারো।

অপর্ণা উঠতে যাচ্ছিল। লোকটা ওকে বাধা দিল। বলল—

তার আগে আর একবার—

কি আর একবার!

তোমার যৌবনের জয়যাত্রা শুরু হোক।

লোকটা হাসলো, সেই কুটিল হাসি। অপর্ণা বুঝতে পারলো সবই। বুঝতে পারলো ও কেন এসেছে, কিসের জন্যে এসেছে। প্রবল শক্তিতে বাধা দেবার চেষ্টা করল ওকে।

হরিদাসী?

কে! চমকে উঠলো হরিদাসী।

আমি।

কে ? মালতি ? আয়—ঘরের মধ্যে আয়।

মালতি এলো।

হারিদাসী বিস্মিত হল। বলল—

এই অল্প সময়ের মধ্যে চেহারার একি হাল তুই করেছিস ?

হরিদাসীর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে মালতি অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে বলল—

ওকে কোথাও খুঁজে পেলাম না হরিদাসী। কোথাও পেলাম না। আখড়ায় পেলাম না, গঞ্জে পেলাম না, পাড়ায় গেলাম সেখানেও পেলাম না। জনে জনে শুধালাম তোমরা কেউ আমার ইন্দ্র নীলকে দেখেছ ? ভারী সুন্দর চেহারা, ঝাঁকড়া চুল ! উত্তর দিল না কেউ। বলতে পারলো না ও কোথায় গেছে।

তুই ওর কথা ভুলে যা মালতি।

কেমন করে ভুলবো বলতে পারো হরিদাসী ?

হরিদাসী মালতিকে নিজের কাছে টেনে নিল।

যেমন করে তুই তোর মা বাবা আত্মীয়-স্বজনকে ভুলেছিস।

মালতির দু'চোখ আবার জলে ভরে উঠেছিল। হাতের পিঠে চোখের জল মুছে নিয়ে মালতি বলল—

মা বাবাকে ভুলতে পেরেছিলাম। কারণ ওদের যখন হারাই তখন আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। ওদের মুখ আমার মনে তখনো স্থান করে নিতে পারেনি। কিন্তু ওকে যে ভুলতে পারবো না। ও আমার কাছে এসেছিল।

মালতি তবু তোকে ভুলতে হবে।

আমি ওকে ভালবেসে ফেলেছি হরিদাসী।

আশ্রমবাসীদের ভালবাসা পাপ।

আমি যে ননীচোরা কালাকে ভালবাসি তাও কি পাপ ?

তা কেন হবে !

হরিদাসী বাধা দিয়ে বলল। উনি যে জগতের নাথ, ওকে কি সবাই

ভালবাসতে পারে, না সে ক্ষমতা সবার রয়েছে,

ইন্দ্রনীল যে আমার কালা।

তবে মর।

হরিদাসী কপট রাগ প্রকাশ করে।

মালতির ছ'চোখ আবার জলে ভরে উঠল। বলল—

যাই আবার খুঁজে আসি।

হরিদাসী ওকে বাধা দিল না, মালতি বেরিয়ে গেল।

হরিদাসী জানে শুধু ঘুরে বেড়ানোই সার হবে মালতির। ও কোথাও খুঁজে পাবে না ছেলেটাকে। ইন্দ্রনীল এতক্ষণ অনেক দূরে চলে গেছে! অসিতও এমনি করে হারিয়ে গিয়েছিল। অপর্ণাও তাকে কোথাও খুঁজে পায় নি।

লোকটা সেই ভোর রাত্রে আবার ওকে ধর্ষণ করল, ওর বিনা অনুমতিতেই। তারপর বলল, চলো আমরা কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে আসি। ছ'মাস কি এক বছর বাইরে কাটিয়ে আমরা আবার ফিরে আসবো। ততদিনে তোমাদের বাড়ীর সবাই তোমাকে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেবে। ভাববে তুমি এই পৃথিবী থেকেই বিদায় নিয়েছো। তোমাকে ও অসিতকে দুর্বার কংসাবতী তার আপন কোলে টেনে নিয়েছে। এতদিন পর আখড়ায় ফিরে এলে কেউ খোঁজ করতে আসবে না।

তবু অপর্ণা অপেক্ষা করেছিল অসিতের জন্যে। সকাল হল, দুপুর হল, বিকেল নামল তবু এলো না অসিত। তারপর এলো অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে নবনী দাস অপর্ণাকে নিয়ে বেরুলো কাশী গয়া বৃন্দাবন হৃষিকেশ। আরো কত জায়গা ঘুরে বেড়াল অপর্ণা আর নবনী দাস।

প্রায় এক বছর পরে ওরা ফিরে এলো। অপর্ণা ততদিনে পাকাপাকি ভাবে হরিদাসী হয়ে গেছে। বৈষ্ণবীর সাজে চেহারা তার সম্পূর্ণ

পাল্টে গেছে। হরিদাসীর মধ্যে অতীতের অপর্ণাকে খুঁজতে যাওয়া এখন বোকামী। বৃন্দাবনে থাকার সময় নবনী দাসই একদিন এক অসতর্ক মুহূর্তে তাকে বলে ফেলেছিল অসিতের কথা। বলেছিল তার ঘর থেকে ফিরে গিয়ে নবনী দাস উদ্ধবকে ডেকে তুলেছিল। দু'জনে মিলে গিয়েছিল অসিতের ঘরে। তারপর প্রায় আধঘণ্টা পরে অসিতকে তুলে নিয়ে ওরা বেরিয়ে এসে কংসাবতীর পথ ধরেছিল। ততদিনে অপর্ণা হরিদাসীতে পরিণত হয়ে গেছে। অসিতের কথা শুনে মনটা তার বিচলিত হয়েছিল মাত্র ক্ষণেকের জন্যে। তার বেশী কিছু নয়।

ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আয়। বেরিয়ে আয় সব।

মালতির ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আনন্দে চীৎকার করে উঠলো উদ্ধব দাস।

বেরিয়ে আয় বেরিয়ে আয় সব।

আবার হাঁক ছাড়লো উদ্ধব দাস।

আনন্দের উত্তেজনায় ওর হাত পা তখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

গভীর রাত্রে উদ্ধব দাসের গগন ফাটানো চীৎকারে আশ্রমের অনেকেরই ঘুম ভেঙ্গে গেল। সকলের আগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো হরিদাসী।

কি গো গোঁসাই, অমন করে চিল্লাচ্ছো কেন? রাত দুপুরে সবার ঘুম ভাঙ্গছো কেন ষাড়ের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে।

কে, হরিদাসী?

হ্যাঁগো গোঁসাই।

ক্ষিপ্র পায়ে হরিদাসীর কাছে এগিয়ে গেল উদ্ধব দাস।

কি ব্যাপার গোঁসাই

হরিদাসীর চোখের কোণে এক ঝলক বিদ্যুৎ।

উত্তেজিত উদ্ধব দাস হরিদাসীর একখানা হাত চেপে ধরল।

একি গোঁসাই!

জিভ কেটে এক হাত পিছিয়ে গেল হরিদাসী।

তুমি কি লোক জড়ো করে সবার সামনে আমার হাত চেপে ধরবে!

লজ্জা পেল উদ্ধব দাস। পিছিয়ে গেল হাত কয়েক।

ইতিমধ্যে আশ্রমের আরো অনেকেই জেগে উঠেছে। সবাই উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে।

জীবন দাস এসেছে, সৌরভ দাস এসেছে, লক্ষ্মণ দাস এসেছে। সবাই এসে জড়ো হয়েছে। সবাইকে দেখে ঈর্ষৎ লজ্জিত কণ্ঠে উদ্ধব দাস বলল—

তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা হরিদাসী। উত্তেজনায় আনন্দে আমি কতকটা বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম।

উদ্ধব দাসকে দেখে সবাই অবাক হয়। ওরা এগিয়ে এসে ওদের গোঁসাইকে ঘিরে ধরে।

তোমরা কিছুই বুঝতে পারছো না?

উদ্ধব দাস একে একে সবার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়।

উত্তেজনায় আবেগে গলা ধরে এসেছে উদ্ধব দাসের।

কেউ অনুমান করতে পারছো না কি ঘটেছে! একে অপরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

তুমিই বল গোঁসাই। আমরা সব তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

মালতির দেহে অমাবস্যা লেগেছে হরিদাসী। অমাবস্যা লেগেছে। আমার তিন বছরের প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে আজ। আজ আমার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। তোমরা সবাই মিলে উৎসবের আয়োজন করো হরিদাসী। এমন উৎসব যা আর কোনদিন হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে না।

হরিদাসী বিস্মিত হয়ে বলল—

সে কি!

হ্যাঁ হরিদাসী। এইমাত্র আমি নিজের চোখে দেখে এলাম।

তুমি ভুল করোনি তো গোঁসাই?

না হরিদাসী।

দৃঢ় কণ্ঠে উদ্ধব দাস বলল—

উদ্ধব দাসের কখনো কোন কাজে ভুল হয় না। কোনদিন কোন কাজেই সে ভুল করেনি! এতোদিন পরে তার কিছুতেই ভুল হতে পারে না।

তুমি ঠিক দেখেছো, অমাবস্যা লেগেছে মালতির দেহে?

আমার কথায় কোনরকম সন্দেহ থাকলে তুমি নিজে গিয়ে দেখে এসো।

তবে আশ্রমকে সাজাই?

সাজাও হরিদাসী, বেশ ভাল করে সাজাও। রোশনাই আনো, বাজনা আনো। সাজাও সাজাও।

তাই হবে।

হরিদাসী মালতির ঘরের দিকে ছুটলো।

ঠাকুর ঠাকুর।

উদ্ধব দাস দৌড়াল রাধারমনজীউর মন্দিরের দিকে।

রাধারমন এতো দিনে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন।

হরিদাসী একরকম ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকলো মালতির ঘরে। মালতি বিছানায় বসে আছে। উঠতে পারছে না।

হরিদাসী জানে অমাবস্যা কাকে বলে। ও জানে বহুর মধ্যে দু চার জনের ভাগ্যে এ সুযোগ আসে। সেই রকম ভাগ্যবানদেরই একজন ঐ উদ্ধব দাস। উদ্ধব দাস অবশ্য চিরকালের ভাগ্যবান

হরিদাসী মালতিকে নিয়ে পড়ল।

আশ্রমে এতো হৈচৈ কেন গো হরিদাসী।

মালতি উঠতে গেলে বাধা দিল হরিদাসী।

কাল উৎসব, তাই ওরা সবাই মিলে আশ্রম সাজাতে লেগেছে। এই অসময়ে কিসের উৎসব ! এমন উৎসবের কথা তো মালতি চোদ্দ বছরের জীবনে শোনে নি।

আজতো অমাবস্যা নয় হরিদাসী ?

মালতি হরিদাসীর কাছে সরে গেল।

হ্যাঁ মালতি, আজকেই অমাবস্যা।

তবে চাঁদ ওঠে কেন রাত্রে।

এ অমাবস্যা আকাশে নয়, মানুষের দেহে লাগে।

মানুষের দেহে অমাবস্যা লাগে কখনো ?

অবিশ্বাসের হাসি হাসলো মালতি।

লাগে।

এবার হরিদাসী হেসে ওঠে।

সকাল থেকেই উদ্ধব দাস ভয়ানক ব্যস্ত। এ উৎসব একেবারে নিখুঁত হওয়া চাই। টাকার কার্পণ্য করলে চলবে না। আশ্রমের সঞ্চিত ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছে উদ্ধব দাস। অর্থের অভাবে কোন কাজ ব্যহত হতে দেবে না। সমস্ত কাজ নিজে তদারক করছে। কোথাও কোন গলদ থাকতে দেবে না সে।

সকালে উঠেই সকলের আগে তলব করেছে হরিদাসীকে। বলে দিয়েছে আজ যেন মালতিকে সারাদিন চোখে চোখে রাখা হয়। কোন কাজ করবে না, আজ আহারে সংযম করবে সারাদিন। তারপর লক্ষ্মণদাসকে পাঠিয়েছে পরিচিত দুই আখড়ায়। পরিচিত দুই গোঁসাইকে নিমন্ত্রণ করে আসবে আশ্রমে। অন্যেরা আশ্রম সাজাতে, পুজোর জোগাড় করতে ব্যস্ত—

মালতি বারান্দায় বসে বসে সব লক্ষ্য করছে। পাশে বসে ওকে পাহারা দিচ্ছে হরিদাসী। এমন করে চুপ করে বসে থাকতে অসহ্য

লাগছে মালতির। তবু সে বাধ্য হয়ে সব সহ্য করছে। দেহের পরিবর্তনকে সে অস্বীকার করতে পারছে না কিছুতেই। মাঝে মাঝে মনে পড়ছে সেই তরুণের কথা। কতদিন হয়ে গেল! সেই যে রাত্রে চলে গেল আজ পর্যন্ত দেখা নেই।

কোথায় গেল সে?

আজও মনের ভেতরটা কেমন করে ওঠে ওর কথা চিন্তা করলে। একটা বেদনা সমস্ত মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ওর দিয়ে যাওয়া ছবিখানা বুকে করে রেখেছে মালতি। যখনই অবসর হয় অথবা কোন অবসর মুহূর্তে তরুণের কথা মনে পড়ে, নিজের ঘরে চলে আসে মালতি। ভাঙ্গা টিনের স্যুটকেশটা খুলে বের করে তরুণের আঁকা ছবিখানা। মেলে ধরে চোখের সামনে। চোখে জল আসে, বুকটা হাহাকার করে ওঠে। কোথায় হারিয়ে গেল? মালতি যদি সেদিন জেগে থাকতো কিছুতেই ওকে ফিরে যেতে দিত না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মালতি।

ঠাকুরের কাছে কতদিন কতো রাতে প্রার্থনা করেছে, ঠাকুর ওকে ফিরিয়ে দিয়ে যাও। ফিরিয়ে দাও ওকে। কত রাত্রে মানত করেছে, ও ফিরে এলে বুকের রক্ত দিয়ে অঞ্জলি দেব। তবু সে আসেনি। এমনি নিষ্ঠুর সে।

উঠোনে গোবর দেওয়া হয়েছে। এ কাজটা মালতি প্রতিদিন নিজের হাতে করে। আজ ওকে কেউ কোন কাজ করতে দেয়নি। জল তোলা ফুল আনা, কোন কাজ নয়।

বেলা দশটা থেকে নামকীর্তন শুরু হল।

উঠোনের মাঝখানে সামিয়ানার নীচে ঠাকুরের মঞ্চ করা হয়েছে। সেখানে নামগান চলছে। জীবন দাস সৌরভ দাস নামগান করছে কর্তাল বাজিয়ে।

হরিদাসী?

কি?

হরিদাসী পাশে বসে কীর্তনের সুরে ঢুলছিল।

আচ্ছা, হরিদাসী কেউ হারিয়ে গেলে সে বুঝি আর ফিরে আসেন না ?

হরিদাসীর একবার ইচ্ছে হল বলে—অসিতের মত কেউ যদি একবার হারিয়ে যায় তাহলে সে আর কিছুতেই ফিরে আসে না। কিন্তু বলতে পারলো না। কারণ সে নিজেও সঠিক জানে না ছেলেটা কোথায় গেছে। ছেলেটাকে আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে নিজের চোখে দেখেছে হরিদাসী। তারপর কি হয়েছে সঠিক জানে না সে। অসিতের মত হারিয়ে যাবার কথা হরিদাসীর অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। উদ্ধব দাস কি সত্যি সত্যিই অতটা নিষ্ঠুর !

কে জানে !

কিন্তু অসিতের মত হারিয়ে যাবার কথা মালতিকে বলতে পারল না হরিদাসী। বলল—

ওরা শিল্পী। ওরা পথের মানুষ। কোন শিল্পী যদি একবার ঘর ছাড়ে একবার যদি পথের প্রেমে পড়ে তারা কোনদিন ঘরে ফিরে আসে না। ঘরকে তারা ঘৃণাই করে মালতি।

কিন্তু ইন্দ্রনীল তো আমাকে ঘৃণা করেনি ? ও আমাকে ভালবেসেছিল।

শিল্পীদের আবার ভালবাসা ! ওরা কি নিজেদেরই ভালবাসে যে পরকে ভালবাসবে !

ওরা কাউকে ভালবাসে না মালতি। না নিজেকে না পরকে। আসলে ওরা ভালবাসে শুধু ঐ প্রকৃতিকে। প্রকৃতির মধ্যে ওরা নিজেরা হারিয়ে যেতে চায়। আমার একটা কথা শোন মালতি—

হরিদাসী মালতির একখানা হাত চেপে ধরে।

কি কথা হরিদাসী ?

তুই ওকে ভুলে যা। মন থেকে ওর কথা সরিয়ে দে।

আমি মরে গেলেও তা পারবো না হরিদাসী।

তবে তুই মর।

হরিদাসী উঠতে যাচ্ছিল। মনে পড়ল উদ্ধব দাসের নির্দেশ। আজ

সারাদিন মালতিকে চোখের আড়াল করা চলবেনা। ওকে চোখে চোখে রাখতে হবে। আবার বসে পড়ল হরিদাসী।

মালতি উঠে দাঁড়াল।

ওকি! কোথায় চললি?

কেন?

উদ্ধব দাস আমাকে হুকুম করেছে সবসময় তোর পাশে পাশে থাকতে হবে। একা কোথাও ছাড়া চলবে না।

উদ্ধব দাসের কথায় বিরক্ত হল মালতি। গোঁসাইকে আজকাল একেবারেই সহ্য করতে পারে না। ওর ভালবাসার মানুষটিকে তাড়াবার জন্যে উদ্ধব দাসই দায়ী। গোঁসাইকে দেখলেই মালতির মনটা কেমন হয়ে যায়।

বিরক্ত মিশ্রিত কণ্ঠে মালতি বলল—

আমি ঘরে যাই।

তাই যা। একটু বিশ্রাম কর। আমি বরং বাইরে বসে একটু নামগান শুনি।

মালতি ঘরের মধ্যে এলো।

আখড়ায় উৎসব। ওরই সবচাইতে বেশী আনন্দিত হওয়া উচিৎ। কিন্তু আনন্দের বদলে দুঃখের বেশ বড় আকারের একটা বোঝা ওর মনের উপরে চেপে বসেছে। বারবার মনে পড়েছে সেই শিল্পীর কথা। শিল্পীর আঁকা ছবিখানা বের করে বুকের উপর চেপে ধরল মালতি।

বুকের ভেতরটা হু হু করছে। কি যেন হারিয়ে ফেলেছে মালতি। ওর মনের সঞ্চয়ের ঘর থেকে কি যেন খোয়া গেছে।

সে এলোনা, এলোনা। নিজের মুখে বিড়বিড় করে বার কয়েক উচ্চারণ করল মালতি।

মালতি—

কে?

মালতি চমকে উঠলো।

আমি উদ্ধব দাস। ঘরে আসতে পারি?

মালতি তাড়াতাড়ি ওর বুকের উপরের ফটোখানা সরিয়ে ফেলল। তারপর বিছানায় শুয়ে শুয়েই বলল—কোন দরকার আছে?

উদ্ধব দাসকে আজকাল একেবারেই সহ্য করতে পারে না। ওকে দেখলেই মনের মধ্যে বিষের জ্বালা উপস্থিত হয়। ত্রিভূবনে যাবার কোথাও জায়গা নেই। থাকলে কবে পালিয়ে যেতো মালতি। থাকতো ঠাকুর উপবাসে। মালতির তাতে কি? কেন আর সবায়ের মত ওকে ওর বাবা মা দেয়নি ঠাকুর? উদ্ধব দাস বলে যে স্বপ্নে দেখেছে ঠাকুর যেন স্পষ্ট বলছেন মালতির হাতের তোলা ফুল নিচ্ছেন। না হলে তিনি সে ফুল গ্রহণ করেন না।

মালতি? এই যে মালতি—

উদ্ধব দাস ঘরের মধ্যে এলো।

সারা সকাল তোমার খোঁজ নেওয়া হয়নি তাই একবার দেখা করতে এলাম।

উদ্ধব দাস মালতির মুখের দিকে চেয়ে হাসছে।

গোঁসাইকে যেন আজ একটু বেশি খুশী খুশী লাগছে!

ব্যাজার মুখে মালতি প্রশ্ন করল।

আজ যে আখড়ায় উৎসব মালতি। আজ তোমার আমার সকলের খুশী হবার দিন। আজ আমরা সবাই খুশী।

আমি কিন্তু খুশী নই।

কেন! তুমি কেন খুশী নও মালতি?

উদ্ধব দাস মালতির কাছে সরে গেল।

আমাকে আশ্রমের কোন কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না কেন?

তোমার দেহে যে অমাবস্যা লেগেছে মালতি। তোমার এই অবস্থায় কোন কাজ করতে নেই।

চুপ করে গেল মালতি।

হরিদাসী তাকে দেখিয়ে দিয়েছে অমাবস্যা কাকে বলে। কিন্তু উদ্ধব দাস সে-কথা জানলো কি করে? এ-কথা তো তার জানার কথা নয়।

আমি চলি মালতি।

খুশীতে ডগমগ করতে করতে উদ্ধব দাস চলে গেল।

সন্ধ্যে উৎরে গেছে। আশ্রম আলোয় আলোয় ভরে রয়েছে। আশ্রমের চার চারটে পেট্রোম্যাক্স বের করে জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। চারদিকে এতো আলো তবু নিজের ঘরে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলিয়ে আছে মালতি।

বাইরে গান হচ্ছে। মূল গায়েন মাধব দাস বাউল সঙ্গীত গাইছে। ভারী সুন্দর গলা মাধব দাসের। উদ্ধব দাস কড়া নির্দেশ দিয়ে গেছে মালতি যেন ঘর থেকে না বেরোয়। হরিদাসী ঘরের দরজার সামনে বসে পাহারা দিচ্ছে।

গরমে ঘামাছে মালতি। বিকেলে নিজের হাতে হরিদাসী স্নান করিয়েছে মালতিকে। সুগন্ধী সাবান এনে দিয়েছিল উদ্ধব দাস। সেই সাবান দিয়ে মালতিকে ভালকরে স্নান করিয়েছে। তারপর স্নান শেষ হলে হরিদাসী ওর সর্বাঙ্গে সুগন্ধি লেপন করেছে। নতুন পট্টবস্ত্র পরিয়েছে। চন্দনের ফোঁটায় অপরূপ করেছে মালতিকে। হারিদাসী সেই যে দরজার সামনে এসে বসেছে, একবারও বাইরে যাবার নাম নেই। ঘরের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসছে মালতির।

ঘরের মধ্যে না হয় বন্ধ করে রেখেছো। কিন্তু তোমরা কি আমাকে আজ খেতেও দেবেনা? মালতি তার অভিযোগ জানাল হরিদাসীকে। খিদেয় পেটের নাড়ী পর্যন্ত হজম হয়ে যাবার যোগাড়। দুপুরে একবার মাত্র দুটো মিষ্টি আর একবাটি দুধ খেয়েছিল মালতি।

আজ আর কিছু খেতে নেই মালতি।

আর কিছুই না?

আজ একটা মাত্র দিন মালতি। জীবনে এ দিন মাত্র একবারই আসে।

তাও আবার সবার জীবনে নয়।
মালতি চুপ করে গেল।
ক্ষোভে রাগে দুঃখে ওর দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে। দুপুরে আজ খিচুড়ী ভোগ হয়েছিল। কত লোক সেবা করল। তার ভাগ্যে এক হাতাও জুটলো না অথচ আশ্রমের সবাই জানে খিচুড়ী প্রসাদ মালতির করত প্রিয়।
আর কতক্ষণ আমাকে এইভাবে বসে থাকতে হবে হরিদাসী?
তা জানে একমাত্র উদ্ধব দাস।
হরিদাসী উদ্ধব দাসের খোঁজে বাইরের দিকে তাকায়।
উঠোনে মাধব দাস তখনো গাইছে।
আচ্ছা, হরিদাসী?
কি?
আজ সারাদিনে আশ্রমে অনেক লোক এসেছে।
হরিদাসী হাই তুললো। এক নাগাড়ে বসে দেহ অবশ হয়ে গেছে চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছে।
সে আসেনি?
সে কে?
হরিদাসী বুঝতে পারেনি।
আমি সেই শিল্পীর কথা বলছি হরিদাসী।
তুই এখনো তার কথা ভাবছিস?
তুমি বল না হরিদাসী সে এসেছিল?
না মালতি। আমি তাকে একেবারো দেখিনি। তুই তার কথা মন থেকে সরিয়ে দে মালতি। সে আর কোনদিন এই আশ্রমে ফিরে আসবে না।
আসবে হরিদাসী। আসতেই হবে তাকে। আমি যে তাকে ভালবেসেছি। আমার ভালবাসাই তাকে আবার আমার কাছে নিয়ে আসবে।

হরিদাসী কোন উত্তর দিল না। মালতি না জানলেও সে নিজে তো জানে উদ্ধব দাস নবনী দাসের দল ওদের কোনদিন আসতে দেয় না। অসিত আসেনি। ঐ ছেলেটা আসবে না। মালতি চুপ করে গেল।

হরিদাসী অতি গোপনে অতি সন্তর্পণে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল।

ক্রমে রাত গভীর হল। কীর্তন শেষ হল মাধব দাসের। শ্রোতার দল একে একে বিদায় নিল আখড়া থেকে।

রাত বারোটার সময় উদ্ধব দাস তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

আখড়া তখন অন্ধকারে ডুবে গেছে। আখড়ার অধিকাংশ বাসিন্দাই শুয়ে পড়েছে। মালতি আসনে বসে ঢুলতে ঢুলতে কখন শুয়ে পড়েছে মেঝের উপরেই। জেগে আছে শুধু হরিদাসী। উদ্ধব দাসের নির্দেশে তখনো বসে আছে মালতির ঘরের দরজা আগলে।

হরিদাসী উদ্ধব দাসের দিকে তাকাল। বিস্মিত হল সে। এতো সেই উদ্ধব দাস নয়। এতোদিন যে উদ্ধব দাসকে সে দেখেছে এ যেন তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষ।

উদ্ধব দাসের চোখ দুটো লাল টকটক করছে। প্রতিদিনের বসনও আজ উদ্ধব দাসের অঙ্গে নেই।

মালতি কি করছে হরিদাসী?

দুই হাতের পিঠে চোখ কচলে নিয়ে হরিদাসী উত্তর দিল—

মালতি মেঝের উপরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওকে তুলে দাও হরিদাসী, ও উঠলে আমার ঘরে নিয়ে এসো।

উদ্ধব দাস চলে গেল তার নিজের ঘরে।

হরিদাসীর ডাকে মালতি ধড়মড় করে উঠে পড়ল।

আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম হরিদাসী?

হ্যাঁরে। সেই কখন থেকে ঘুমিয়েছিলি!

তবে আমাকে ডাকলে কেন?

উদ্ধব দাস এসেছিল। বলে গেল তোকে নিয়ে এখুনি ওর ঘরে যেতে।

আর খানিকটা পরেও তো ডাকতে পারতে হরিদাসী। তাহলে স্বপ্নটা এমন করে অসম্পূর্ণ থেকে যেতো না।

কার স্বপ্ন দেখছিলি ?

হরিদাসী মালতিকে নিয়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

জানো হরিদাসী, সে এসেছিল। হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিল। যখন এগিয়ে এসে ও আমার হাত ধরল তখনই তুমি আমাকে জাগিয়ে দিলে।

এখন চল, ও ঘরে যেতে হবে।

মালতির সমস্ত অঙ্গ অবশ। তবু ওকে উঠতেই হবে। উদ্ধব দাসের নির্দেশ। অন্যদিন হলে প্রতিবাদের ঝড় তুলতো। কিন্তু আজ দেহের সাথে সাথে মনটাও যেন অবশ হয়ে গেছে। উদ্ধব দাসের নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সামান্যতম শক্তিটুকুও বুঝি ওর মধ্যে অবশিষ্ট নেই।

হরিদাসী ওর হাত ধরে নিয়ে যাবার জন্যে কাছে এলো।

তোকে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে মালতি। এই বেশে তোকে যে দেখবে সাধ্যি কি তার, তোর উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

তোমাকে আর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে হবে না হরিদাসী। ও-ঘরে কিসের প্রয়োজন আছে, চল মিটিয়ে আসি। এসেই কিন্তু ঘুম। তখন আর কোন কথাই শুনবো না। ঘুমে আমার দু'চোখ জড়িয়ে আসছে।

তাই চল। দেরী হলে আবার উদ্ধব দাস চেঁচামেচি শুরু করবে।

ওরা দু'জন উদ্ধব দাসের ঘরের দরজার সামনে এলো।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। সামান্য ইতস্তত করে হরিদাসী বলল—

মালতি এসেছে।

হরিদাসী ?

হ্যাঁ।

একটু অপেক্ষা করো হরিদাসী। আমি এখুনি দরজা খুলে দিচ্ছি।

মিনিটখানেকের মধ্যেই উদ্ধব দাস ঘরের দরজা খুলে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মালতি নাকে-মুখে আঁচল চাপা দিল। একটা কটু গন্ধ বেরিয়ে আসছে ঘরের মধ্যে থেকে।

এসো মালতি। আমাদের অনুষ্ঠান এখুনি শুরু হবে।

মালতির হাত ধরার জন্যে উদ্ধব দাস এগিয়ে এলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মালতি কয়েক পা পিছিয়ে গেল। উদ্ধব দাসের গায়েও সেই গন্ধ।

মালতি ?

ধমকে উঠলো উদ্ধব দাস।

বিস্মিত হল মালতি। উদ্ধব দাসের এমন কণ্ঠস্বর জীবনে আর কোনদিন সে শোনে নি। মালতি ভয়ে ভয়ে হরিদাসীর দিকে তাকাল।

যা মালতি। আর দেরী করিস না। রাত অনেক হয়ে গেছে।

হরিদাসী ওকে ঘরের ভেতরে নিয়ে যাবার জন্যে হাত ধরল।

সেই ভালো, তুমিই ওকে নিয়ে এসো হরিদাসী। উদ্ধব দাস ঘরের ভিতর চলে গেল।

ঘরের ভিতর ঢুকে মালতি চমকে উঠল। ঘরের মধ্যে আরো তিন জন মানুষ উপস্থিত রয়েছে। ওদের সবাইকে চেনে মালতি। হৃদয়পুরের চৈতন্য দাস, মাঝের গ্রামের কৃষ্ণদাস আর ব্রজবল্লভপুরের বলাই দাস। ওরা সবাই চক্রাকারে আসন পেতে বসেছে। চতুর্থ আসনে বসেছে উদ্ধব দাস নিজে। চার জনের সামনে চারটে মাটির সরা। পাশে একটা টেবিলে কালো বোতল। ওদের মাঝখানে ছোট্ট একটা বিছানা পাতা রয়েছে। আর রয়েছে কিছু ফুল-চন্দন ও গঙ্গাজলের পাত্র।

এ কোন পূজা! মালতিই তো আখড়ার সমস্ত অনুষ্ঠানের উপাচার বা উপকরণ যোগাড় করে দেয়। কিন্তু এমন উপকরণ তো কোনদিন দেখে নি মালতি। ও বুঝতে পারছে না সামনের ঐ শয্যাটাইবা কেন!

মালতি, তুমি ঐ শয্যায় এসে বস।

উদ্ধব দাস হুকুম করল তার নিজের আসনে বসে।
ইতস্তত করছিল মালতি।
এতোগুলো পুরুষের সামনে সে কেমন করে গিয়ে বসবে?
যা মালতি, ওখানে গিয়ে বসগে।
হরিদাসী নিজে অনুরোধ করল।
আর পারছে না মালতি। শরীর যেন ভেঙ্গে পড়ছে। বিনা প্রতিবাদে এবার শয্যার উপরে গিয়ে বসল মালতি।
হরিদাসী এবার বিদায় নিল ঘর থেকে।
উদ্ধব দাসের মনের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে আজ সারাদিন ধরে। এ আনন্দের জন্ম হয়েছিল গতকাল রাত্রে। নবনী দাস যা পায়নি সেই দুর্লভ রত্ন আজ উদ্ধব দাসের করতলগত। উদ্ধব দাস জানে, কত মঠের, কত আখড়ার আউল-বাউল, বৈষ্ণবের দল এই দুর্লভ দিনটির কামনায় সারা জীবন কাটিয়ে দেয়! তবু বেশীর ভাগের ভাগ্যেই এদিন আসে না। উদ্ধব দাস সেইসব স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবানদের একজন যাদের জীবনে এই দিনটি এসে থাকে।
ঘরের মধ্যে বেশ বড় আকারের একটা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছিল। উদ্ধব দাস সলতে উস্কে দিয়ে প্রদীপে বেশ খানিকটা ঘি ঢেলে দিল।
কৃষ্ণ দাস চৈতন্য দাস ও বলাই দাস নিজ নিজ আসনে সমাসীন।
উদ্ধব দাস সামনের সরায় তার পাশে রাখা বোতল থেকে খানিকটা তরল পদার্থ ঢেলে নিল। তারপর তারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে এলো। হরিদাসী বারান্দায় বসে ছিল, তাকে অপেক্ষা করতে বলল।
শয্যার উপরে বসে মালতি কল্পনা করার চেষ্টা করছিল, এবার তার উপরে কি হুকুম করবে উদ্ধব দাস।
উদ্ধব দাস এগিয়ে গেল মালতির কাছে।
মালতি নড়েচড়ে বসল।
মালতি এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি। এই প্রথম দেখতে পেলো তার

শয্যার পাশেই আর একটা আসন পাতা রয়েছে। উদ্ধব দাস সেই আসনটার উপরে গিয়ে হাঁটুগেড়ে বসল। উদ্ধব দাসের চোখ দুটো লাল টকটক করছে। ওর মুখ থেকে একটা উৎকট গন্ধ বেরিয়ে আসছে। গন্ধে মালতির নাড়িভুড়ি পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে চাইছে। মালতি কোনরকমে নিজেকে সংযত রাখল।

মালতি ?

উদ্ধব দাস এবার ঝুঁকে পড়ল মালতির দেহের পরে।

মালতি কোন উত্তর না দিয়ে প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে তাকাল উদ্ধব দাসের মুখের দিকে

উদ্ধব দাস বলল—

এবার তোমার পরণের শাড়ীখানা খুলে ফেলতে হবে মালতি।

আমার পরণের শাড়ী ?

মালতি বিস্মিত !

হ্যাঁ।

কিন্তু অন্য শাড়ী তো এ ঘরে আনি নি ?

অন্য শাড়ীর প্রয়োজন হবে না।

মালতি বিশ্বাস করতে পারছে না, কি বলতে চাইছে উদ্ধব দাস !

সময় বয়ে যাচ্ছে মালতি। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

আমি শাড়ী খুলতে পারবো না।

মালতি !!

চীৎকার করে উঠলো উদ্ধব দাস।

না।

এবার বুঝে উঠলো মালতি।

শরীর ও মনের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে মালতি।

উদ্ধব দাস আর অপেক্ষা করতে পারছে না। সে হাত বাড়াল মালতির পরণের শাড়ীর দিকে। ফোঁস করে উঠে দাঁড়াল মালতি।

খবর্দার আমার শাড়ীতে হাত দেবেনা গোঁসাই।

উঠে দাঁড়াল উদ্ধব দাসও। এগিয়ে গেল বন্ধ দরজার দিকে।
দরজা খুলে হরিদাসীর উদ্দেশ্যে বলল, হরিদাসী তুমি না এলে মালতি সহজ হতে পারছে না।
হরিদাসী ঘরের মধ্যে এলো।
মালতী তেমনি উদ্ধত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে।
শাড়ীখানা খুলে ফেল মালতি।
হরিদাসী এগিয়ে গিয়ে মালতীর একখানা হাত চেপে ধরল।
তুমি মেয়ে হয়ে এই কথা বলছো হরিদাসী? এতোগুলো পুরুষের সামনে আমি আমার পরণের শাড়ী খুলে ফেলব? কখনো না।
আমার একটা কথা শোন মালতি।
কোন কথা নয় হরিদাসী।
নিজের সম্মান নিজের কাছে থাকতে ওরা যা যা বলে করে যা মালতি।
কেন? কেন করব? আর বিবস্ত্র হলেই কি আমার সম্মান থাকবে?
তুই কি বুঝতে পারছিস না ওরা আজ তোকে কিছুতেই রেহাই দেবে না?
তবে কি জোর করবে?
প্রয়োজন হলে তাই করবে মালতি।
তুমি তখন কি করবে?
আমার কোন উপায় নেই।
ওরা যদি জোর করেই তাহলে আমিও দেখে নেবো ঐ গোঁসাইকে
হরিদাসী?
উদ্ধব দাস গর্জন করে উঠলো।
আমি কি একা ওর সাথে পারি উদ্ধব দাস?
তোমাকে পারতেই হবে!
পারবো না গোঁসাই।
হরিদাসী!
হরিদাসী তোমার সব কথা শুনতে বাধ্য নয়।

হরিদাসী হুম্‌ হুম্‌ করে পা ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

উদ্ধব দাস মিনিটখানেক কি যেন ভাবলো হারিদাসীর চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে। তারপর হঠাৎ মালতিকে কোনরকম সর্তক হবার সুযোগ না দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর গায়ের উপরে। বার-কয়েক হ্যাঁচকা টান মেরে খুলে ফেলল মালতির শাড়ী।

মালতির পরনে সায়া আর গায়ে একখানি ব্লাউজ শুধু।

উদ্ধব দাসের দৃষ্টি যেন মালতির অনাবৃত অংশের মাংস খুবলে খুবলে খাচ্ছে।

মালতি সত্যি সত্যিই এবার ভয় পেয়ে গেল। উদ্ধব দাসের চোখ দুটো জবাফুলকেও হার মানিয়েছে। মেজাজ দেখিয়ে কোন লাভ হবে না। ওর লজ্জা হরণ করতে উদ্যত হয়েছে উদ্ধব দাস। এবার অনুরোধের পথ ধরল মালতি।

তোমার দুটি পায়ে পড়ি গোঁসাই, আমাকে ছেড়ে দাও, আমার আর অবমাননা করো না, আমাকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে দাও।

হাসলো উদ্ধব দাস।

অত্যন্ত ক্রূর হাসি।

মালতির মনে হল একটা হায়েনা ওর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

তোমাকে ছেড়ে দেবার জন্যে আমি প্রায় দু'বছর ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছি?

তবে কি বলির পাঁঠার মত আমাকে বড় করেছো?

এ বলি নয় মালতি, এ তোমার সৌভাগ্য। এমন সুযোগ পেলে যেকোন মেয়েই নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করত।

তোমার কি একটুও মায়ামমতা নেই!

কর্তব্য আমার কাছে সবার আগে। আমাকে আমার কর্তব্য করতে দাও মালতি। তুমি যত বেশী বাধা দেবে ততই আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবো। নাও খুলে ফেল তোমার সায়া!!

সায়া !!

হ্যাঁ মালতি, তোমাকে সম্পূর্ণ অনাবৃত হতে হবে।

না, কখনো নয়।

বাধা দিওনা, অবাধ্য হলে ফল আরো খারাপ হবে।

আমার পরনের সায়া আমি কিছুতেই খুলতে দেবো না।

এইযে—চৈতন্য দাস—

কি উদ্ধব দাস ?

চৈতন্য দাস উঠে দাঁড়াল।

আমাকে একটু সাহায্য করো চৈতন্য দাস।

বেশতো—

চৈতন্য দাস এগিয়ে গেল মালতির কাছে।

সাবধান গোঁসাই।

মালতি ধমকে উঠলো।

চৈতন্য দাসকে থমকে দাঁড়াতে দেখে উদ্ধব দাস ক্রুদ্ধস্বরে বলল—

ঐ ছোট্ট একফোঁটা মেয়ের ধমকে ভয় পেয়ে গেলে চৈতন্য দাস ? যাও ওকে নিরাবরণ করো। অকারণ আমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে।

হরিদাসী ! চীৎকার করে হরিদাসীকে ডাক দিল মালতি। হরিদাসী নারী, নারীর চরম অবমাননার বিরুদ্ধে ওকে সাহায্য করতে হরিদাসী নিশ্চয় এগিয়ে আসবে। কিন্তু হরিদাসীর উত্তর পেল না মালতি।

আর দেরী নয় চৈতন্য দাস। তুমি ওকে চেপে ধরো।

চৈতন্য দাস তার শক্ত দুই বাহুর সাহায্যে জড়িয়ে ধরল মালতির কোমল দেহটাকে। আর সেই অবসরে সায়াটা খুলে নিল উদ্ধব দাস।

আঃ ভগবান !! লজ্জায় চোখ বন্ধ করল মালতি।

মালতি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। ওর গায়ের ব্লাউজটাকেও ওরা বাদ দিল না।

ওকে বিছানার উপরে জোর করে শুইয়ে দাও চৈতন্য দাস।

উদ্ধব দাসের কথা শেষ হবার আগেই চৈতন্য দাস বিছানার উপরে ঠেসে ধরল মালতিকে। মালতি কোন বাধাই দিল না।

বাধা দেবার আর ছিলই বা কি ! কৃষ্ণ দাস তুমিও যাও
উদ্ধব দাসের কথায় কৃষ্ণদাসও এগিয়ে গেল। দু'জনে মিলে ঠেসে ধরে রাখল মালতিকে। আর উদ্ধব দাস তার লকলকে জিভ নিয়ে ঝুঁকে পড়ল মালতির নিম্নাঙ্গের উপরে !
প্রকৃতিকে বাধা দেবার জন্যে একফালি কাপড় বেঁধে দিয়েছিল হরিদাসী মালতির গোপন অঙ্গে। উদ্ধব দাস সেই বাধাও সরিয়ে ফেলল। রক্তে ভিজে গেছে সেই কাপড়ের টুকরো
মালতির প্রথম ঋতুর রক্তে ভেজা কাপড়।
এবার উদ্ধব দাস মুখ লাগিয়ে রক্ত চুষে নিতে লাগলো মালতির দেহ থেকে। তারপর সেই রক্ত এনে ঢালতে লাগলো সবার মদের মধ্যে। মরার মত শুয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই মালতির।
উদ্ধব দাসের শেষ হলে একে একে এগিয়ে গেল বলাই দাস চৈতন্য দাস ও কৃষ্ণ দাস। নিজ নিজ পাত্র পূর্ণ করল মালতির দেহ নিসৃত তপ্ত রক্তে। তারপর শুরু হল ওদের বিন্দুপান তিনজনে পান করতে শুরু করল মালতির দেহ নিসৃত রক্ত-মদ। মালতি কোন বাধাই দিল না কাউকে। বাধা দেবার ক্ষমতাও ছিল না ওর।
পরদিন সকালে উঠেই উদ্ধব দাস মালতির ঘরে গেল। গতকাল রাত দুটোর সময় সে নিজে মালতিকে পৌঁছে দিয়ে গেছে।
মালতি—
মালতি কোন সাড়া দিল না।
মালতি !
আবার ডাক দিল উদ্ধব দাস। তবু কোন সাড়া নেই।
এবার বিস্মিত উদ্ধব দাস দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল। ভিতরে গিয়ে দেখল মালতি ঘরে নেই। চিন্তিত উদ্ধব দাস মালতির ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে ঠিক তখনই দেখা হল ইন্দ্রনীলের সাথে ইন্দ্রনীলের সে চেহারা আর নেই। চুলগুলো উস্কোখুস্কো, চোখ দুটো কোন গভীরে চলে গেছে ! ইন্দ্রনীলই বলল—থাকতে পারলাম না গোঁসাই। মনে

হল মালতি আমার জন্যে ভয়ানক কাতর হয়ে উঠেছে তাই চলে এলাম। মালতির সাথে আজ দেখা করতে দেবে তো?

গোঁসাই এগিয়ে এসে ইন্দ্রনীলের চুলের মুঠো চেপে ধরল—

বল মালতি কোথায়?

আমি তো মালতির খোঁজেই এসেছি গোঁসাই।

তোকে বলতেই হবে মালতি কোথায়?

উদ্ধব দাস ক্ষেপে উঠেছে।

জানিনা।

ইন্দ্রনীল উত্তর দিল।

জানিনা বললে তোমাকে ছাড়া হবে না যুবক। মালতিকে বের করে দিতেই হবে।

ও জানে না, মালতি কোথায় গেছে।

কে, হরিদাসী?

হ্যাঁ।

হরিদাসী উদ্ধব দাসের সামনে এল।

মালতিকে যদি দেখতে চাও, তাহলে আখড়ার উত্তর দিকের আম বাগানে যাও। মালতি সেখানে পরম নিশ্চিন্তে ঝুলছে।

কি বলছো হরিদাসী?

উদ্ধব দাস ইন্দ্রনীলের চুলের মুঠি ছেড়ে দিল।

আমি কোন দিন মিথ্যে বলি না উদ্ধব দাস।

মালতিকে দেখবার জন্য উদ্ধব দাস আমবাগানের দিকে ছুটলো।

হরিদাসী যুবকের কাছে সরে এলো। কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে বলল—

সেই তো এলে, দুটোদিন আগে আসতে পারলে না? হতভাগি যে তোমাকে ভালবেসে তোমার আশ্রয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। কি ক্ষতি হত তোমার আর দুটোদিন আগে এলে?

আমার ঠিকানা ছিল লাইফ ইনসিওরেন্সের তিন তলা বিল্ডিং। তিনতলা বিল্ডিংটা পার হলেই বাঁদিকে লালমাটির কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। কাঁচা রাস্তা ধরে ফার্লংখানেক এগিয়ে গেলে ডানদিকে প্রাচীর ঘেরা একতলা বাড়ী। সেই বাড়ীর লোহার গেটে জোরে জোরে গুনে চারটে শব্দ করলেই দরজা খুলে যাবে।

অঘ্রান মাসের সন্ধ্যে। বাতাসে শীতের কামড় থাকায় হাফ-হাতা কালো সোয়েটারটা গায়ে চড়িয়ে নিয়েছিলাম অন্ধকার হলেও এল আই সির তিনতলা বাড়ীটা চিনতে অসুবিধা হল না। খড়্গপুর স্টেশন থেকে রিকশায় পাঁচসিকে ভাড়া। দক্ষিণা মিটিয়ে দিয়ে য়্যাটাচিটা নিয়ে নেমে পড়লাম। বাড়ীটা অতিক্রম করতে কাঁচা রাস্তাটাও চোখে পড়ল।

অনন্যা ধর্মতলা স্ট্রীটে জ্যোতি সিনেমার সামনে যখন এলো, মাত্র চারটে বেজে দশ মিনিট অতিক্রান্ত হয়েছে। এখনো প্রায় পঞ্চাশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। অজয় কথা দিয়েছে, ঠিক পাঁচটার সময় এসে পৌঁছাবে। য়্যাড্ভান্স টিকিট কাটা আছে। সাড়ে পাঁচটায় শো। আরো দেরী করে এলেও কোন ক্ষতি ছিল না। তবু অজয় কথা দিয়েছিল ঠিক পাঁচটায় আসবে। অনন্যার যদি দেরী হয়, উল্টোদিকের ফুটপাথে অজয়কে যেন খুঁজে নেয়।

অজয় বরাবরই ভীড় অপছন্দ করে।

তবু তুটোর সময় অনন্যা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিল।

মা ওর পাশেই শুয়েছিলেন, তিনি বাধা দিয়েছিলেন।

আজ তো রবিবার, কলেজ নেই। আজকে আবার তোর এতো তাড়া কিসের? সপ্তাহে একটাইতো দিন। একটু শুয়ে বিশ্রাম কর। শরীর ভাল হবে। চেহারা তো দিনে দিনে ঝোড়োকাকের মত হচ্ছে।

ছন্দা বলছিল, "সেই চোখ" দেখতে যাবে। সেই চোখে উত্তম কুমার নাকি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম অভিনয় করেছেন।

টিকিট পাবি?

অনন্যা জানে, মা উত্তম কুমারের ভীষণ ভক্ত। উত্তম অভিনীত কোন বই মা বাদ দেন নি। উত্তমের বই দেখতে যাবার নাম করলে মা বাধা দেবেন না কিছুতেই।

ছন্দা বলেছে, টিকিট কেটে রাখবে।

ফিরে এসে গল্পটা বলবি কিন্তু।

মা পাশ ফিরলেন।

এদিকে অনন্যা প্রমাদ গুনলো। "শোলে" দেখে এসে "সেই চোখে"র গল্প বলবে কিকরে? ফেরার পথে তাহলে ভারতীতে নেমে সেই চোখের একখানা বই কিনে গল্প পড়ে নিতে হবে।

কাগজেও তো এখনো কোন সমালোচনা বেরোয় নি। তাহলে কাগজ পড়েই কাজ চালিয়ে নিত।

বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গায়ে জল ঢালল অনন্যা। ভাদ্রের পচা গরম। গায়ে ঘাম বসে ঘামাচি উঠেছে। স্নান সারা হলে সারা গায়ে ঘসে ঘসে পাউডার মাখল। অয়নার সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুলের মধ্যে চিরুনী চালাল, তবু তিনটে বাজার লক্ষণ নেই।

ঘড়িটা যেন প্রমিস করেছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবে।

মনটা ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ী পরবার সময় নিজেকে বেশ ভাল করে লক্ষ করল। আবার অন্য একটা শাড়ী পাল্টে নিল।

ঠিক সাড়ে তিনটের সময় বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল অনন্যা। আর আশ্চর্য, বাড়ী থেকে রাস্তায় পা দিতেই একটা খালি ট্যাকসি!

এই ট্যাকসি—

চীৎকার করে ট্যাকসিওয়ালাকে থামাল অনন্যা।

অথচ যখন প্রয়োজন হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়েও ট্যাকসির টিকিটি পর্যন্ত দেখা যায় না।

কোথায় যাবেন?

ধর্মতলা।

ট্যাকসিতে হেলান দিয়ে বসে পড়ল অনন্যা।

মনের সাথে শরীরটাও ছটফট করছে। অজয়ের সাথে দেখা না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

সামনেই ভারতী।

একটু থামান।

ব্রেক কসল ড্রাইভার। ট্যাকসি থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে ভারতীর সামনে গেল অনন্যা।
ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। গেটের কাছেই একটা ছেলে সিনেমার বই বিক্রী করছে। সেই বইটি একখানা তুলে নিয়ে দাম মিটিয়ে আবার ট্যাকসিতে ফিরে এলো।
চলুন।

ট্যাকসি ছুটছে।
আঃ! কোথাও কি ট্রাফিক জ্যাম হতে নেই কলকাতায়! পথঘাট এতো ফাঁকা হল কবে থেকে? ঘড়ির কাঁটাটাও চলছে না। কখন যে পাঁচটা বাজবে, কে জানে! এলগিন রোডের মোড় পার হয়ে গেল। তবু পথে ভীড় নেই।
চোখ বুঁজলো অনন্যা।
ডাক্তার কি রিপোর্ট দেবে কে জানে! এতো ভাবলে মারা পড়ে যাবে। তারচেয়ে অজয়ের কথা ভাবা থাক।
পূজোর সময় মা ও দিদির সাথে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিল। জামাইবাবু দার্জিলিংয়ে স্টেট ব্যাংকে চাকরী করেন। দিদি বেড়াতে এসেছিলেন। মাকে তো ছাড়লোই না, ওকেও না। অথচ দার্জিলিং যাবার কোন ইচ্ছেই ছিল না অনন্যার। ছন্দারা সবাই মিলে নাকি নাটো গিয়েছিল বাস রিজার্ভ করে। অনন্যাকে বার বার অনুরোধ করেছিল ওদের সাথে যাবার জন্যে, যাওয়া হল না। মা ওকে ছাড়লেন না কিছুতেই। বাপীর সম্বন্ধে কোন কথাই ওঠে না। বাপী শুধু তার ব্যবসা ছাড়া এই পৃথিবীতে অন্য কিছু থাকতে পারে, বাপীর সেকথা জানা নেই।
দর্জিলিং একটুও ভাল লাগে না অনন্যার। দার্জিলিং আর কুইনাইনের বড়ির মধ্যে কোন পার্থক্য আছে একথা কিছুতেই সে স্বীকার করতে

চায় না। অনন্যার ধারনা, যার সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে সে দ্বিতীয়বার দার্জিলিং যাবে না কিছুতেই। তবে হ্যাঁ, দুই শ্রেণীর লোকেদের দার্জিলিং ভাল লাগবে। দু'বার কেন, বার বার ভাল লাগবে। যাঁরা দিওয়ানা, যাঁরা কবি। এদের দার্জিলিং ভাল লাগতে বাধ্য। প্রেমিক কাঞ্চন-জংঘার দিকে তাকিয়ে তার প্রেমিকার কথা চিন্তা করবে আর কবি কাঞ্চনজংঘার দিকে তাকিয়ে ছন্দের সন্ধান করবে।

অনন্যার দার্জিলিং যেতে না চাওয়ার আর একটা কারণ দিদির দেওর। পাগলের তাড়া সহ্য করা যায়। পগলা কুকুরের তাড়াও বরং দাঁত মুখ খেচিয়ে সহ্য করা যেতে পারে কিন্তু দিদির দেওরের তাড়া? ওরে বাবাঃ! ওর চেয়ে ষাঁড়ে তাড়া করুক, তবু ভালো। ঐ একটি কারণে অনন্যা দার্জিলিংয়ের নাম মুখে আনতে পারে না।

ভদ্রলোক জামাইবাবুর ব্যাংকেই কাজ করেন। বয়সে জামাই বাবুর থেকে বেশ ছোট। দেখতে শুনতেও যে খুব একটা খারাপ তাও নয়। তবু অনন্যা ওকে সহ্য করতে পারে না। পারে না ভদ্রলোকের আঁঠালু চরিত্রের জন্যে। এঁটেল যেমন করে পায়ে গায়ে সেঁটে থাকে অবনীবাবুও তেমনি মেয়েদের গায়ে লেপ্টে থাকতে চান।

মেয়েদের গ্যাস দেবার যদি কোন প্রতিযোগিতা থাকতো, অবনীবাবু নিঃসন্দেহে অলম্পিক চাম্পিয়ান হতে পারতেন।

দার্জিলিংয়ে গিয়ে অনন্যার প্রধান কাজ হল, অবনীবাবুর হাত থেকে পালিয়ে বেড়ানো। ভদ্রলোকের দেরীতে ওঠা অভ্যাস। অনন্যা ভোরে উঠে গরম জলে হাত মুখ ধুয়ে কিছু মুখে দিয়ে চা-টা ফ্লাকসে ভরে নিয়ে চলতে শুরু করত।

যতদূর চলে যাওয়া যায়।

আর অবনীবাবুর কাজ ছিল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তন্নতন্ন করে ওকে খুঁজে বের্‌ করা। অনন্যা বেশীর ভাগ দিনই চলে যেতো বোটানিক্যাল গার্ডেনে। এখানে লুকিয়ে থাকার সুবিধা অনেক।

ধর্মতলায় কোথায় যাবেন ?

চমকে উঠলো অনন্যা।

ট্যাকসি ধর্মতলার বুকে পড়েছে।

জ্যোতির সামনে থামবেন।

ধর্মতলায় এখন প্রচুর লোক চলাচল করে। আবার একসময় আসে যখন এতবড় রাস্তাটা একেবারে নির্জন হয়ে যায়।

দেখতে দেখতে জ্যোতি সিনেমা এসে গেল।

ব্রেক কসল ড্রাইভার।

মিটার দেখে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে নেমে পড়ল অনন্যা।

ঘড়িতে মাত্র চারটে বেজে দশ মিনিট।

এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে ভারী অসহ্য লাগে। হাজার চোখের খোঁচা খেতে হয়। কেউ বা দু'একটা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে।

বহুদিন ধরে "শোলে" চলছে জ্যোতিতে। তবু ভীড়ের শেষ নেই। হাউসফুল। কামাই নেই। বার বার কি যে দ্যাখে একটা বইয়ের ! অনন্যা তো এই প্রথম আসছে।

না ! লোকের ভয়ংকর দৃষ্টি ! সহ্য করতে পারছে না অনন্যা। তার চেয়ে 'কমলালয়ে' গিয়ে জিনিষপত্র দেখে সময়টা কাটান ভাল। সঙ্গে কিছু টাকাও রয়েছে। পছন্দ হলে মার্কেটিং করে নেবে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে 'কমলালয়ে' ঢুকে পড়ল।

দোকানে মোটেই ভীড় নেই। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো অনন্যা।

একসময় পরিশ্রান্ত হয়ে রেস্টুরেণ্টে গিয়ে বসল।

এক গেলাস লস্যি।

মনটা কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না। অজয় এলে কি হবে কে জানে !

বেয়ারা লস্যি রেখে গেল টেবিলে।

অনন্যা লস্যির গেলাসের মধ্যে ডুব দিয়ে পৌঁছে গেল দার্জিলিংএ।

সেদিনও যথারীতি অবনীবাবুর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সাত সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিল অনন্যা।

তখন সাতটাও বাজেনি। ভোরের আলো সবে ফুটেছে। নিজে চা বানিয়ে ফ্লাকসে ভরে খানকয়েক বিস্কুট নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—

এতো সকালে কোথায় যাচ্ছিস?

স্বাস্থ্য রক্ষা করতে।

উত্তর শুনে মা আর কোন কথা বলেন নি।

এই কয়দিনেই কলকাতার জন্যে মন হাঁপিয়ে উঠেছে। ম্যালে গেলে কলকাতার গন্ধ পাওয়া যাবে। পুজোর ছুটিতে এবার গোটা কলকাতা যেন দার্জিলিংএ ভেঙ্গে পড়েছে।

দার্জিলিংএ এসে লোকে যতই জলাপাহাড়ে যাক, সিমলে থেকে যাক অথবা টাইগার হিলে যাক কলকাতাবাসীদের কাছে দার্জিলিংএর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ম্যাল। মানে চৌরাস্তা। দার্জিলিংএর স্থানীয় অধিবাসীরা আবার ম্যাল বললে বোঝেন না। ওদের বলতে হয় চৌরাস্তা। হাঁটতে হাঁটতে অনন্যা ম্যালে চলে এলো।

এর মধ্যেই ম্যাল জনারণ্য হয়ে উঠেছে। কতকাতার বাবুতে বিবিতে ভরে উঠেছে সব। রেলিং ধরে দাঁড়াবে, সেরকম জায়গা নেই। চেপে যে বসবে তেমন উপায়ও নেই।

বছর কয়েক আগেও পুজার সময় দার্জিলিংএ শুধু কলকাতার বাবুরাই বেড়াতে আসতো। এখন দার্জিলিং সর্বভারতীয় ব্যাপার হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের বাইরের লোকেরাও কম যান না। অবাঙ্গালীর কাছে দার্জিলিংএর আকর্ষণ বাড়িয়েছে বম্বের সিনেমা ওয়ালারা। ওরা দলে দলে এখানে স্যুটিং করতে আসছেন, আর সারা ভারতের লোককে দার্জিলিং দেখে যাবার প্রলোভন দেখাচ্ছেন।

একদল বোম্বাই মার্কা ছোকরা ওকে দেখে বিশ্রী ভাবে শিষ দিয়ে উঠলো। অনন্যার ইচ্ছে হচ্ছিল ওদের শিষের উত্তরে দেয় কটা থাপ্পর। এগিয়ে চলল অনন্যা একটু বসার জায়গার সন্ধানে।

দার্জিলিংয়ের আর এক আপদ বুড়োবুড়ির দল। ওরা যে কি করতে

মরতে আসে কে জানে! বুড়ো বয়সে প্রেম বুলি উথলে ওঠে। এই বয়সে ছানি পড়া চোখে কি খোঁজে ঐ বুড়োবুড়ির দল কাঞ্চন-জংঘার মধ্যে কে জানে!

একবার থমকে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে দেখে নিল। যদিও এখনো অবনীর আসার সময় হয়নি, তবু সাবধানের মার নেই। ভদ্রলোক মরীয়া হয়ে উঠেছে। কে জানে—ধরবার জন্যে রাত থাকতে উঠে বসে আছে কিনা।

না কাউকে দেখতে পেল না।

এগিয়ে চলল।

যারা কাঞ্চনজংঘা দেখতে এসেছিল, তারা হতাশার নিঃশ্বাস ফেলছে। সকাল থেকে দারুণ কুয়াশা। তারওপরে আকাশে মেঘ জমেছে। ঠাণ্ডাও পড়েছে বেশ। অনন্যা উলের চাদরটা এনেছিল, ওটা গলায় জড়িয়ে নিল: ঠাণ্ডা লাগলে টনসিলটা আবার টনটন করে।

স্থানীয় ছেলে মেয়েরাও ভীড় জমাতে শুরু করেছে সুযোগ বুঝে। কেউ গাইড সেজে দু-পয়সা কামাচ্ছে, কেউ বা বিভিন্ন পোঁজে দাঁড়িয়ে থেকে কোন চিত্রপরিচালক বা প্রয়োজকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে অনন্যা। ফিরতে গিয়ে যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠলো! কিছু দূরে অবনীকে দেখতে পেল অনন্যা।

অবনী হন হন করে তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

এখন উপায়? ম্যালে এখন ভীড় নেই যে ভীড়ের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নেবে। তবু ওকে বাঁচতেই হবে অবনীর হাত থেকে। ধরা পড়ে গেলে অবনীর অফিস কামাই হবে, ওর সারাটা দিন মাটি হবে। অবনী এখনো গজ তিরিশেক দূরে আছে। ভীড় ঠেলে ওর কাছাকাছি আসতে মিনিট দুই সময় লাগবেই। এই সময়টুকুর মধ্যে বাঁচবার জন্যে একটা কিছু করতেই হবে। অবনীর হাতে ধরা পড়া আর রেলিং টপকে তিন হাজার ফুট নীচের গভীর খাদের মধ্যে

লাফিয়ে পড়ার মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই। শেষপর্যন্ত যদি কোন উপায় দেখতে না পায় তাহলে অনন্যা ঐ খাদের মধ্যেই ঝাঁপ দেবে। ঝাঁপ দিলে মৃত্যু আসবে একবার। কিন্তু ঐ লোকটার হাতে ধরা পড়লে দগ্‌ধে দগ্‌ধে মরতে হবে সারাদিনে কয়েকশোবার।

অনন্যা আর একবার চেয়ে দেখলো অবনী মোহন আরো কাছে চলে এসেছে। তিরিশ গজের জায়গায় দূরত্ব এসে দাঁড়িয়েছে তিরিশ হাতের মত। এবার এগোতে গিয়েই সিনেমার রাজলক্ষ্মী দেবীমার্কা এক বঙ্গজননীর সাথে সজোরে ধাক্কা।

ভদ্রমহিলা সামান্য নড়ে উঠলেন। আর অবনীমোহন ছিটকে চার পাঁচ হাত পিছিয়ে গেল। অন্য সময় হলে অনন্যা হেসে গড়াগড়ি যেতো। এখন ওর জীবনমরণ সমস্যা। হাসতে গিয়েও হাসিটা ব্রেক খাবার মতন থেমে গেল।

ভদ্রমহিলা বেশ জোরেই কি সব বলতে শুরু করেছেন, ঠিক রাজলক্ষ্মী দেবীর মতই। অবনীমোহন হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

এই অবসর।

আশ্রয়ের আশায় অনন্যা দ্রুত এদিক ওদিক তাকাল।

হ্যাঁ একটা উপায় রয়েছে। বাধ্য হয়ে অনন্যাকে সেই পথে যেতে হবে।

আর কিছু চাই !

অনন্যা চমকে উঠলো। সে ভুলেই গিয়েছিল কমলালয়ের রেস্টুরেণ্টে বসে লস্যির গেলাসে চুমুক দিচ্ছে।

বেয়ারা সামনে এসে প্রশ্ন করছে আর কিছু চাই কিনা।

অনন্যা কব্জিঘড়ির দিকে চেয়ে দেখতে পেল মাত্র সাড়ে চারটে। এখনো আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে! তার চেয়ে পাখার তলায় বসে আরো এক গেলাস লস্যি সেবা করা যাক।

আরো এক গেলাস লস্যি দিয়ে যাও।

বেয়ারা চলে যেতেই অনন্যা তার মনটাকে আবার দার্জিলিংয়ের পথে

ছুটিয়ে দিল।

এখানে বসেও যেন অনন্যা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তাকে ধরবার জন্যে বারকয়েক হাত জোড় করে মাথা ঝাঁকিয়ে ভদ্রমহিলাকে অতিক্রম করার অনুমতি নিচ্ছে।

অনন্যা পিছন ফিরলো—

রেলিংয়ের ধারে একটি ছেলে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানে এসেই ছেলেটাকে লক্ষ করেছে অনন্যা। শুধু ও নয়, এখানকার বেশীরভাগ মানুষও ওকে দেখছে। ওর চেহারার মধ্যে এমনই একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে ওর দিকে না তাকিয়ে পারা যায় না। ওর পোষাকটাও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের অন্যতম কারণ। চার-দিকের মিনি ম্যাক্সি প্যাণ্ট স্কার্ট-এর ভীড়ে ছেলেটার সাদা ধুতি সার্জের পাঞ্জাবী বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। জীবনে এই প্রথম অনন্যা মনে মনে ধুতি পাঞ্জাবীর প্রশংসা না করে পারলোনা।

শুনুন—

অনন্যা এগিয়ে গেল।

ছেলেটা হয় ওর ডাক শোনেনি অববা অন্যন্যা যে ওকে ডাকতে পারে ভাবতে পারেনি, তাই অনন্যার ডাকে কোন সাড়া দিল না।

অনন্যা এবার ছেলেটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

আপনাকেই বলছি, এদিকে শুনুন একবার।

ছেলেটা এক মুখ বিস্ময় নিয়ে অনন্যার দিকে ফিরলো।

আমাকে বলছেন ?

হ্যাঁ।

কি বলুন ?

অনন্যা একবার মেয়েদের স্বাভাবিক ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে অবনীর দিকে চেয়েই আবার ছেলেটার দিকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো।

আমাকে একটা লোকের হাত থেকে আপনাকে বাঁচাতে হবে।

কেউ বুঝি পেছন নিয়েছে ?

হ্যাঁ !

কই দেখিয়ে দিন তো, দেখি লোকটাকে এই ঠাণ্ডার মধ্যে গরম করে দিতে পারি কিনা ! লোকটাকে দেখবার জন্যে ছেলেটি পিছনের দিকে ফিরলো ।

আঃ—ওদিকে চাইছেন কেন ?

চাপা কণ্ঠে ধমকে ওকে অনন্যা ।

তবে ?

ছেলেটার বিস্ময় আরো বেড়ে যায় ।

মনে মনে ছেলে জাতটার উপরেই চটে যায় অনন্যা । ছেলে জাতটাই এমন বোকা যে ওদের মাথায় তাড়াতাড়ি কিছুই ঢুকতে চায় না ।

যে লোকটা তেড়ে আসছে সে আমার দিদির দেওয়র ।

ও তাই নাকি ! তবে তো ভদ্রলোককে গরম করা চলবে না ।

চলবেই নাতো ।

তাহলে আমাকে কি করতে হবে বলুন তো ?

অনন্যা এবার আরো চটে যায়—

ঘটনাটা আপনাকে বোঝাতে না বাঝাতেই ভদ্রলোক আমাকে তার নিজের খপ্পড়ে নিয়ে ফেলবে । তার চেয়ে মৃত্যুও আমার পক্ষে ভাল ।

ছেলেটা এবার তার বাঁ হাতে ধরা কৌটাটা ঝেড়ে নিয়ে বলল—

বেশ তাহলে বলুন আমাকে কি করতে হবে ?

একটু ইতস্তত করে অনন্যা বলল—

এই ধরুন, আপনি আমার সাথে প্রেম করছেন ।

য়্যা ! কি বললেন ?

ধরুন আপনি আমার সাথে প্রেমের অভিনয় করছেন । ভদ্রলোক দেখতে পেলে শক পাবেন এবং এখান থেকে চলে যাবেন । এই সহজ কথাটা আপনার মাথায় ঢুকছেনা কেন ?

ছেলেটি এবার হেসে ফেলল । বলল—

এবার ঢুকেছে ।

আঃ তাড়াতাড়ি। এসে পড়বে।

তা আপনার নামটা বলুন ?

অনন্যা। শুরু করুন এবার। এসে পড়ল বলে—

ছেলেটি এবার বলতে শুরু করল—

দ্যোখো অনন্যা, আমি আর একটা দিনও অপেক্ষা করতে পারছি না। কলকাতায় ফিরে গিয়ে—

কথাটা অসমাপ্ত রেখে নীচুগলায় ছেলেটা প্রশ্ন করল, আপনি কলকাতার তো ?

হ্যাঁ হ্যাঁ—নিন সুরু করুন।

কলকাতায় ফিরে গিয়েই বিয়ের প্রস্তাবটা পাড়তে হবে।

তুমি ঠিক বলেছো অবনীশ! সামনের অঘ্রানে যাতে আমাদের বিয়েটা হয়ে যায় তাই কর: হ:ব।

আমার নাম অবনীশ নয়।

ছেলেটা আবার ফিস ফিসিয়ে বলে।

তা কিছুক্ষণের জন্যে আপনি যদি অবনীশ হন তাতেই বা ক্ষতি কি ? নিন শুরু করুন। ও আমাদের কাছেই এসে পড়েছে।

আচ্ছা অনন্যা, আজকের রাতটা সেদিনের মত কোন হোটেলে কাটানো যায় না ?

দেখি, যদি মাকে ফাঁকি দিতে পারি তাহলে আজ আসবো। তুমি এভারেস্টে একটা ফ্ল্যাট ঠিক করে রাখবে কিন্তু।

অবনীশ অনন্যার পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনলো। এরপর কোন তৃতীয় পক্ষের উপস্থিত থাকা উচিৎ নয়। অতএব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবনী ফিরে গেল।

অনন্যা আগাগোড়াই আড় চোখে অবনীর গতিবিধির উপরে নজর রাখছিল। ওকে চলে যেতে দেখে হাসি চাপতে পারল্যে না। বেশ জোরেই হেসে উঠলো।

ছেলেটা অবাক।

অমন করে হাসছেন কেন ?

ফিরে গেছে মশাই—

কে ?

যার জন্যে এতসব করা।

কোথায় ? দেখিয়ে দেবেন ভদ্রলোককে ?

ঐযে ঐ লোকটা, নীল কোট গায়ে, মাথার পিছনে টাকের আভাষ ? হন হন করে হাটছে ? এমন করে আঘাত দিয়ে তাড়ালেন ভদ্রলোককে ?

দেখুন অবনীশবাবু, এছাড়া অন্য কোন উপায় খুঁজে পাইনি ভদ্রলোকের হাত থেকে বাঁচার।

আমার নাম কিন্তু সত্যি সত্যিই অবনীশ নয়।

তবে ?

অজয়, মানে অজয় মুখোপাধ্যায়।

এবার গম্ভীর হল অনন্যা।

আপনার এই উপকার মনে থাকবে অজয়বাবু।

তাহলে এভারেস্ট হোটেলের কি হবে ?

অজয় হাসতে হাসতে প্রশ্ন করল।

তেমনি হেসেই অনন্যা উত্তর দিল—

যদি প্রয়োজন হয় বলে যাবো। আচ্ছা চলি—

এখনি চলে যাবেন ?

অনন্যা এবার সোজাসুজি ছেলেটার মুখের দিকে তাকাল। মুখখানা ভারী সুন্দর। দেখলে কেমন যেন একটা মায়া এসে যায়।

আপনি কি একাই এসেছেন ?

না।

তবে একা কেন ?

বন্ধুরা দল বেঁধে কালিম্পং গেছে। আমার ভাল লাগেনি তাই যাইনি।

কালিম্পং আপনার ভাল লাগে না ?

না, ঠিক তা নয়। অনেকবার গেয়েছি কিনা। বরং ম্যালে কখনো খারাপ লাগে না। এখানে এসে অনেক চিন্তার মধ্যে ডুবে যাই। ভালই লাগে।

আপনি রোজ আসেন ?

তা আসি।

দেখুন অজয়বাবু—

অনন্যা ইতস্তত করল কথাটা শেষ করতে।

যা বলার বলে ফেলুন।

কাল আসবেন ?

ইচ্ছে তো আছে।

কাল যদি আবার আপনার সাহায্য চাই ?

সাহায্য বলতে ?

মানে ঐ ভদ্রলোক যদি কালকে আবার তেড়ে আসেন ?

আপনার জন্যে আমার সাহায্য সব সময়ের জন্যে থাকবে।

আচ্ছা চলি।

হাত তুললো অনন্যা।

নমস্কার !

অনন্যা এবার স্খলিত পদক্ষেপে হাঁটতে শুরু করল। অবনীর চরিত্র এই কদিনেই ও পড়ে ফেলেছে। ও এখান থেকে সোজা বাড়ী চলে যাবে। তারপর অফিসে বের হবার আগে পর্যন্ত আজকের ঘটনার কথা একে একে সবাইকে শোনাবে। তা যাখুশী শোনাক। কেউ বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। মায়ের অগাধ বিশ্বাস আছে তাঁর মেয়ের উপরে। সেজন্যে কিছুই ভাবছে না অনন্যা ? তবু এখন বাড়ী যাওয়া চলবেনা। অবনী বাড়ী থেকে না বেরোনো পর্যন্ত ওকে বাইরেই থাকতে হবে।

অগত্যা পা চালাল অনন্যা। ম্যালে থেকে নেমে এলো মার্কেটে। এদিক ওদিক ঘুরলো। রেস্টুরেণ্টে ঢুকে ডিম সেদ্ধ ও কফি

খেলো। একবার আরো নীচের দিকে নেমে গেল। সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে এলো স্টেশনে। তারপর ঘড়িতে দশটা বেজে দশ মিনিট অতিক্রম করে গেলে বাড়ীতে ফিরে এলো।

অনন্যা তখন হাঁপাচ্ছে। তবু মনের কোথাও কোন খেদ নেই। মনটা বেশ ভালই আছে। বাড়ীতে আসতে মা ও দিদি এক সাথে ছুটে এলেন।

তোর আজ এতো দেরী হল কেনরে খুকী?

অনন্যা আগে থেকেই ব্যাপারটা আঁচ করে রেখেছিল। তবু ধরা দেবে না ঠিক করল।

দার্জিলিংএ এলে ঘুরতে ফিরতে একটু দেরী তো হবেই। তা তোমরা কি ভেবে নিয়েছিলে, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি?

মা বললেন—

এটা তোর বিদেশ, পথ হারানো বিচিত্র কি।

দার্জিলিং কিন্তু বাংলা দেশের মধ্যে বলেই সেই ছোট বেলা থেকে পড়ে এসেছি মা।

তা হলেই বা! তবু তো তার কাছে বিদেশের মতই। তুই সমতলের মানুষ, পাহাড় সম্বন্ধে তোর কতটুকুই বা ধারণা!

ধারণা যাই থাক, হারিয়ে তো যাইনি?

বেশ করেছিস! তবে কাল থেকে একা বাইরে বেরোতে পারবি না। বাইরে যেতে হয়, অবনী রয়েছে, সেই তোকে বেড়াতে নিয়ে যাবে। অবনী বলছিল, সেই তো তোকে নিয়ে সমস্ত দার্জিলিং এমনকি আশে পাশের সমস্ত অঞ্চল ঘুরিয়ে আনতে পারে।

পারে নাকি?

অনন্যা কোনমতে হাসি চাপলো।

কেন পারবেনা, আজ বিশ বছর সে দার্জিলিংএ কাটাচ্ছে।

তা হয়তো পারবে। তবে দার্জিলিংএ এবার কলকাতা থেকে যেসব

মোটা মোটা ভদ্রমহিলারা এসেছেন, তাদের সাথে বার বার ধাক্কা খেলে বেড়ানোটা কিভাবে হবে ?

কি যাতা বলছিস খুকী ?

অনন্যা এবার হো হো করে হেসে ফেলল। কোনরকমেই হাসি চাপতে পারল না। হাসতে হাসতে মায়ের উদ্দেশ্যে বলল—

জানো মা, দিদির দ্যাওর করেছে কি—দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়ে ধরবে বলে দে দৌড় ! আর যায় কোথায়, সামনে এক প্রাচীর ! জোরে এক ধাক্কা।

আবার হেসে ফেলল অনন্যা

ম্যালেতে তুই আবার প্রাচীর পেলি কোথায় রে ?

দিদি এবার দ্যাওরের পক্ষ সমর্থন করল।

ইঁটের প্রাচীর ছাড়া বুঝি আর প্রাচীর হতে নেই ?

আর কিসের প্রাচীর ?

মা প্রশ্ন করেন। হাসি হাসি মুখ মায়ের।

অনন্যা আবার শুরু করল—

ধরো, তোমার মত তিনজন যদি গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়ায়, তবে সেটা প্রাচীর হবে না ?

তিনজন মিলে অবনীর পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল ?

বারে ! তিনজন হবে কেন ?

তবে ? তুই যে বললি যদি মার মত তিনজন দাঁড়িয়ে পড়ে !

তিনজন হবে কেন ? আমি তো ওটা একটা উদাহরণ দিচ্ছিলাম—

কিযে সব বলছিস বাপু, মাথায় আমার কিছুই ঢুকছে না।

অনন্যা আবার হাসলো। কি যে হয়েছে সকাল থেকে, কিছুতেই সে আর হাসি থামাতে পারছেনা, হাসতে হাসতে বলল—

আমি তিনজনের কথা বলিনি মা !

কি বলেছিস তবে ?

থ্রি ইন ওয়ান, এই কথাই বলেছি। মানে, তোমার মতন তিনজনকে

মিলিয়ে যে চেহারা হয়, ভদ্রমহিলার একার চেহারাই সেরকম।
তাতে কি হয়েছে ?
হবে আবার কি ? এক ধাক্কা, আর এক ধাক্কাতেই দিদির দেওর কুপোকাৎ।
ওসব কথা বাদ দেতো খুকী।
দিদি এবার আরো কাছে এগিয়ে এলো।
তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ঝগড়া করার জন্যে তৈরী।
ঝগড়ার কথা এখন থাক খুকী, অবনী ঠাকুরপো বলছিল, তুই নাকি ম্যালেতে কোন ছোঁড়াকে বলেছিস, আজ রাতের জন্যে হোটেলে মানে এভারেস্টে ঘর ভাড়া নিতে ?
তোর দেওর বলেছে একথা ?
আলবৎ বলেছে।
তা তুই তোর প্রাণের দেওরটিকে একবার জিজ্ঞাসা করলি না কেন, তিনি ওখানে কেন গিয়েছিলেন।
কেন গিয়েছিলেন ?
সেকথা তোর দেওর যখন অফিস থেকে ফিরবে তখন জিজ্ঞাসা করবি। তারপর যদি কিছু বলার থাকে আমাকে তখন বলবি।
অনন্যা স্থান ত্যাগ করে নিজ ঘরে চলে গেল। তারপর বালিশে মুখ গুঁজে ফুপিয়ে উঠলো। এই জন্যই সে দার্জিলিং আসতে চায় না। কটা দিন বুনো মোষের মত যে লোকটা তাকে সমস্ত দার্জিলিং তাড়া করে নিয়ে বেড়াল, তার কোন দোষ হল না, আর যে নিজের মান-সম্মান বাঁচাবার জন্য দৌড়ে পালাল, সমস্ত দোষ গিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে। বারে—ছুনিয়ার বিচার !
খুকী ?
অনন্যা বুঝতে পারলো মা এসেছে মেয়েকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে।
কোন উত্তর দিলনা অনন্যা।
এই খুকী ?

কি ?

তুই নাকি একটা ছেলের সাথে ম্যালেতে দাঁড়িয়ে আলাপ করছিলি ?

কি হয়েছে তাতে ?

অনন্যা আবার ফোঁস করে উঠলো।

কি আবার হবে। কিছুই হয় নি। আলাপ করেছিস, বেশ করেছিস।

মা অনন্যার একরাশ ঘন চুলের মধ্যে আঙ্গুল ডুবিয়ে আস্তে আস্তে টেনে দিতে লাগলেন, অনন্যা চোখ বুঁজলো।

হ্যাঁরে খুকী ?

কি ?

মায়ের আদরে রাগ পড়ে গেছে অনন্যার।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

বল ?

ছেলেটা নাকি দেখতে খুব সুন্দর !

সুন্দরই তো।

অনন্যা আবার বালিশে মুখ গুঁজলো।

তা একদিন নিয়ে আয় না বাড়ীতে। কেমন সুন্দর ছেলে, আমিও একবার দেখে নিই। অনন্যা কোন উত্তর দিল না।

কাল আনবি ?

এবারো চুপ করে রইল।

নিয়ে আয়না কালকে।

আমি কি ঠিকানা জানি নাকি ?

ঠিকানা দেয়নি ?

না।

কাল দেখা হবে ?

যদি আসে, হতে পারে।

তাহলে কাল সকালে চলে যাস। একেবারে সাথে করে নিয়ে আসিস বাড়ীতে।

আচ্ছা তাই হবে।

আর কিছু চাই ?

বেয়ারা এসেছে।

অনন্যা নিজের মনেই হেসে ফেললো।

পাঁচটা বাজতে পনর মিনিট বাকী আছে। এবার নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়া যেতে পারে। লস্যির বিল মিটিয়ে দিয়ে অনন্যা উঠে পড়ল। মাঝে মাঝে ছুই একটা এরকম কমলালয় থাকা উচিৎ। তাহলে অনন্যাদের মতো অবস্থায় যারা পড়ে, সময় কাটাতে তাদের বড় একটা অসুবিধা হয় না। পায়ে পায়ে অনন্যা জ্যোতি সিনেমার দিকে এগিয়ে চলল। পথে লোক চলাচল এর মধ্যে অনেক বেড়ে গেছে। এখনো পনেরো মিনিট। অজয় সময় সম্বন্ধে ভয়ানক সচেতন। যখন যে সময় দিয়েছে, ঠিক সেই সময়েই এসেছে। অনন্যার মনে পড়ে না, অজয় কোনদিন নির্ধারিত সময়ের পরে এসেছে। বরং দু'পাঁচ মিনিট আগেই এসেছে।

জ্যোতির সামনে ভীড় বাড়ছে।

হাউস ফুল।

অবশ্য সেজন্য অনন্যার চিন্তা করার কিছু নেই। টিকিটের ভার নিয়েছে অজয় নিজেই। অনন্যা যখন জ্যোতির সামনে এলো তখনো পাঁচটা বাজতে দেরী আছে।

অনন্যা একপাশে সরে দাঁড়াল। এখুনি শুরু হবে নানান রকমের মন্তব্য। কেউ শিষ দেবে, কেউ টিকিট দেখাবে, কেউ সঙ্গে যেতে ইসারা করবে।

অবশ্য এজন্য অনন্যা ছেলেদের খুব বেশী একটা দায়ী করে না। তার মতে মেয়েরাই দায়ী। মেয়েরা আস্কারা না দিলে ছেলেরা এতো সহস পাবে কোত্থেকে। কতকগুলো মেয়ে আছে, যারা একখানা সিনেমা টিকিটের বদলে সব দান করে, ক'টা টাকা হাতে গুঁজে দিলে দেহ দান করতেও কসুর করে না। এখানে দাঁড়িয়ে অসংখ্য মানুষের

দৃষ্টির তীরে বিদ্ধ হওয়ার চেয়ে রাস্তার ওপারে গিয়ে স্মৃতির রোমন্থনে ডুব দেওয়াও অনেক ভাল।
দেখবে না, দেখবে না করেও অনন্যার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল লোকটার উপরে। দশাসই এক পাঁইজী। ওর দিকে যেভাবে তাকাচ্ছে তাতেই অনন্যার ভয় হল। লোকটা ওকে চোখ দিয়েই না গিলে ফেলে। ইয়া বড় বড় চোখ। বাঁ হাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুলের সাহায্যে গোঁফে কেমন তা দিচ্ছে।

অনন্যা তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে ওপারে চলে গেল।
পরের দিন খুব সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়ল। চায়ের জন্যে অপেক্ষা করলে অবনী মোহনের ঘুম ভেঙ্গে যাবে। রাস্তায় কোন দোকান থেকে যা হোক কিছু খেয়ে নেবে।
সাতটা বাজার আগেই ম্যালে উঠে এলো।
ম্যালে এর মধ্যেই ভীড় জমে গেছে। কলকাতার ভ্রমন বিলাসীর দল জমায়েৎ হয়েছে। ম্যালের সেই এক চেহারা এক ডায়লগ। মেয়েরা এখানে এসেও শাড়ীর চর্চা ও রান্নার ফিরিস্তি যেমন ছাড়তে পারে না, তেমনি ছেলেরা ছাড়তে পারে না রাজনৈতিক কচকচানি। সামনে অমন সুন্দর কাঞ্চনজংঘা দেখেও কি করে যে লোকে রাজ-নৈতিক বুলি ও তত্ত্ব আওড়াতে পারে বুঝতে পারে না অনন্যা।
অনন্যা এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে রেলিং এর দিকে অগ্রসর হল। অজয় মুখোপাধ্যায়কে যেমন করেই হোক মায়ের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ভীড় কাটিয়ে লোকের ঠেলা বাঁচিয়ে অনন্যা রেলিংয়ের কাছে এলো। অজয় নেই। আবার চাইলো অনন্যা।
কাল যেখানে অজয় এসে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে কালো স্যুট পরা অন্য কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে।
অপেক্ষা করবে না ফিরে যাবে?
অনন্যা ঘড়ি দেখল। সাতটা বেজে পনর মিনিট হয়ে গেছে। মাকে

কথা দিয়েছিল অজয়কে নিয়ে যাবো। অথচ ছেলেটাই এলোনা। ফিরে যাওয়া ঠিক করল অনন্যা। এখানে অপেক্ষা করলে আবার অবনী মোহনের খপ্পড়ে পড়তে হবে।

একি চলে যাচ্ছেন যে !

অনন্যা চমকে উঠে মুখ তুললো।

আপনি !

চিনতে পারছেন না ?

কি করে চিনবো ?

কেন ?

আপনি যে খোল নলচে সব পাল্টে এসেছেন।

তাহলে কাল আপনি আমার খোল নলচেটাই দেখেছিলেন, আমাকে দেখেন নি। মিষ্টি করে হাসলো অজয়। লজ্জা পেল অনন্যা।

আপনি ধুতি পাঞ্জাবীর জায়গায় একেবারে উল্টো ! মানে, প্যাণ্ট সোয়টার কি করে চিনবো ?

আপনার দেখছি ধুতি পাঞ্জাবীই পছন্দ ?

সবার বেলায় কিনা জানিনা, তবে আপনার বেলায় নিশ্চয়।

বেশ, কাল থেকে আমাকে শুধু ধুতি পাঞ্জাবীতেই দেখতে পাবেন।

আমি কিন্তু আমার নিজের পছন্দের কথা বলেছি। কারো পছন্দ পাল্টাতে বলিনি।

আচ্ছা সে দেখা যাবে।

কতক্ষণ এসেছেন ?

অনন্যা মাথা নীচু করল।

আপনি আসার মিনিট পনর আগে।

হাসলো অজয়।

একটা কথা—

কি বলুন ?

সেই ভদ্রলোকের খবর কি ? আর দেখা হয়নি তো ?

ওঃ, দিদির দ্যাওরের কথা বলছেন ?

হ্যাঁ, যার জন্যে আপনার সাথে আলাপ হল।

তিনি যথারীতি বহাল আছেন।

আজকেও আসবেন নাকি ?

অপেক্ষা করলে আসতে পারে।

তবে কি করতে হবে ?

আমার সাথে চলুন।

আপনার সাথে যেতে আমার কোন আপত্তি নেই। আপনি যেখানে যেতে বলবেন আমি প্রস্তুত।

মোস্ট ওবিডিয়েণ্ট মনে হচ্ছে ?

হেসে ফেলল অনন্যা কথা শেষ করে।

কেন কালকে ওবিডিয়েণ্ট ছিলাম না ? যখন ভদ্রলোক তেড়ে আসছিল তখন ওবিডিয়েণ্ট না হলে আপনার অবস্থাটা কি হত বলুনতো ?

আমার অভিযোগ তুলে নিচ্ছি।

তাহলে বলুন কোথায় যেতে হবে ?

না, অন্য কোথাও নিয়ে যাবো না আপনাকে—

তবে ?

আমার মায়ের কাছে। যাবেন ?

অনন্যা হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

নিশ্চয় যাবো। তবে এই পোষাকে ?

কোন অসুবিধা নেই। তাছাড়া পোষাক সম্বন্ধে আমার মায়ের কোন মাথাব্যথা নেই।

বেশ তবে চলুন।

ওরা বাড়ীর পথ ধরল।

কলকাতায় কোথায় থাকেন ?

অনন্যা প্রশ্ন করল।

বালিগঞ্জ।

এখানে একা ?

একাই আমার ভাল লাগে মিস—

অনন্যা চ্যাটার্জী।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। একাই আমি বেড়াতে ভালবাসি। তবে দার্জিলিংএ আমি একা আসিনি।

আর কে কে এসেছেন ?

তুই বোন ও কাকীমা।

মা ?

হঠাৎ অজয় চুপ করে গেল। তারপর ধীরে ধীরে বলল—মা নেই।

বাবা নিশ্চয় আছেন ?

না।

তবে ?

সংসারে আমি একেবারে একা। তাইতো নিঃসঙ্গ থাকতে আমার ভাল লাগে।

বোনেরা ?

অনন্যা খুব আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল।

খুড়তুতো বোন। ঐ কাকীমার মেয়ে।

কাকীমার কোন ছেলে নেই বুঝি ?

নেই বলেই তো আমাকে ছেলের মত দ্যাখেন।

চমকে উঠলো অনন্যা। সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে অবনী মোহন।

পথ ছেড়ে দিন।

অনন্যা এগিয়ে গেল।

আমি আপনাকেই খুঁজতে বেরিয়েছি।

আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমরা বাড়ীতেই যাচ্ছি।

মুখ কাঁচুমাচু করে অবনীমোহন পথ ছেড়ে দিল।

হাসতে হাসতে অজয় বলল—

ভদ্রলোক আপনাকে সত্যিই ভালবাসে।

কি জানি। অনন্যা বলল, হয় তো বাসে। কিন্তু সবাইকে কি ভালোবাসা যায় ?

তা অবশ্য যায় না।

একটা দোতলা বাড়ীর সামনে এসে থেমে গেল অনন্যা।

এটাই আমার দিদির বাড়ী। মা ও আমি কলকাতা থেকে এসেছি।

অস্মুন ভেতরে।

আগে খবর দেবেন না ?

কোন দরকার নেই।

অনন্যা এবার এগিয়ে এসে অজয়ের একখানা হাত ধরল।

ওরা দু'জনে বসার ঘরে গেল। সেখানে অজয়কে বসিয়ে রেখে মাকে খবর দিতে গেল অনন্যা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবারের প্লেট হাতে করে অনন্যার মা ঘরের মধ্যে এলেন।

তোমার কথা কাল আমার মেয়ের কাছে শুনেছি বাবা, তাই দেখার ইচ্ছে হয়েছিল। মেয়েকে বলেছিলাম নিয়ে আসিস একবার, দেখবো।

অজয় ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

দু'হাত বাড়িয়ে মাকে প্রণাম করল।

মা খুশী হলেন।

থাক বাবা থাক। বড্ড খুশী হলাম তোমাকে দেখে।

কিন্তু একি ! ঘড়িতে পাঁচটা বেজে গেল যে ! অজয় এখনো এলোনা কেন ?

অনন্যা ভয়ানক অস্থির হয়ে উঠলো। ওর সাথে পরিচয় হবার পর থেকে কখনও তো অজয় কথার খেলাপ করেনি ? তবে কি পথে কোন বিপদ হল ? না রিপোর্ট, সেই সর্বনাশেরই খবর দিয়েছে। অজয় তাই আসতে দেরী করছে ?

চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল অনন্যা। অজয়ের কোন চিহ্ন কোথাও নেই! তবে কি? আর যেন ভাবতেও পারে না অনন্যা। তবু মনে হয়, তার চরম বিপদের কথা জেনে অজয় যদি এখন কেটে পড়ে? তাওকি সম্ভব?

নিজেকেই প্রশ্ন করে অনন্যা। ওর মন বলে, তা কিছুতেই সম্ভব নয়। অজয়। অজয়—নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছে।

অনন্যা এবার জ্যোতির তলায় এলো।

সাড়ে পাঁচটায় শো কিন্তু এরই মধ্যে দারুণ ভীড় জমে উঠেছে। শোলে দশ মাস ধরে চলছে জ্যোতিতে তবু এখনো ভীড় কমেনি। এখানে এলে মনে হবে এই গত সপ্তাহে কি আগের সপ্তাহে বইখানা রিলিজ হয়েছে।

ভীড়ের মধ্যেও কোথাও নেই অজয়। এদিকে পাঁচটা বেজে দশ মিনিট হয়ে গেল। কি করবে স্থির করতে পারছে না অনন্যা। আর একটু অপেক্ষা করবে না ফিরে যাবে?

অনন্যার মনের যখন এই অবস্থা ঠিক তখনই একটা ট্যাক্সি এসে ব্রেক কসল। ট্যাক্সিতে অজয়কে দেখতে পেল অনন্যা।

অনন্যা দৌড়ে গেল ট্যাক্সির কাছে।

এতো দেরী হল যে? খবর কি?

একটু দাঁড়াও অনন্যা। ট্যাক্সির ভাড়াটা মিটিয়ে দিই।

অনন্যাকে আর বলতে হবে না, ইউরিন পরীক্ষার রিপোর্টে কি বেরিয়েছে! অজয়ের ব্যবহারই সেকথা বলে দিচ্ছে—

আমি খুব লজ্জিত অনন্যা। এই প্রথম আমি শুধু তোমার কাছে নয়, কারো কাছে—মানে ডাক্তারের কাছেও সময় দিয়ে ঠিক সময়ে উপস্থিত হতে পারি নি।

কি হয়েছিল?

সব বলছি। আগে চলো, হলে যাই। একটু দম নিয়ে তারপর সব বলছি।

বেশ তাই চলো।

ওরা দুজনে হলে ঢুকে নির্দিষ্ট জায়গায় বসল

এবার বলো রিপোর্টে কি আছে?

অনন্যা অজয়ের একখানা হাত নিজে হাতে টেনে নিল।

আমরা যে আশংকা করেছিলাম—

কথাটা অসমাপ্ত রেখে অজয় অনন্যার মুখের দিকে চাইল।

কি—আমাদের আশংকার পরিণতি কি হল তাই বলো অজয়।

শুনে তুমি নার্ভাস হবে নাতো?

আঃ! তুমি বড্ড দেরী করছ অজয়! যদিও বুঝতে পারছি তুমি কি বলবে তবু তোমার মুখ থেকে শোনার জন্যে আমি আগ্রহী।

আমাদের আশংকা সত্যে পরিণত হয়েছে।

কথাটা শোনার সাথে সাথে অনন্যার মুখখানা পাংশুবর্ণ ধারণ করল। সে বলল, কই দেখি রিপোর্ট?

এই দেখ।

রিপোর্টটা পকেট থেকে বের করে অজয় ওর হাতে তুলে দিল।

অনন্যা রিপোর্টটা মেলে ধরল চোখের সামনে। অজয় মিথ্যে বলেনি। পেটে তার সন্তান এসেছে, ইউরিন কালচার তাই বলছে। এরমধ্যে কোথাও কোন ভুল নেই।

খুব সন্তর্পণে রিপোর্টটা অজয়কে ফিরিয়ে দিল।

ভয় পেয়ে গেলে?

অজয় অনন্যার হাতে সামান্য চাপ দিল।

ভয় আমি পাইনি অজয়। তবে—

তবে কি?

যে সংবাদ শুনে মেয়েরা সবচেয়ে খুশী হয়, সেই সংবাদটাই আমাকে দারুণ এক দুঃচিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

তোমার মনে আমার জন্যে যদি কোন সংশয় থাকে, তাহলে বলো আমি আগামী কালই তোমাকে নিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে যাই।

ছিঃ! অজয়।

অনন্যা ওকে মৃদু তিরস্কার করল। বলল—

আমার লোক চিনতে ভুল হয় নি। আমি জানি তুমি কোনদিনই আমাকে বিপদে ফেলবে না। তবে দুঃখ আমার কোথায় জানো, তোমার আমার নামের পাশে কলংকের কালো দাগ পড়বে এটা আমি চাইনি।

কলংক মোচনের তো যথেষ্ট উপায় আছে অনন্যা।

আমাকে ভাবতে দাও।

রাত বারোটা বাজলো দূরের কোন টাওয়ারে। তবু ঘুম আসছে না দু'চোখে। অথচ এই কাল রাতেও সাড়ে দশটার মধ্যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল অনন্যা।

মা জেগে ছিলেন। মেয়েকে উসখুস করতে দেখে বললেন—

এখনো ঘুমাসনি অনু?

না মা, ঘুম আসছে না।

শরীর খারাপ হয়নি তো?

কই—ঠিক বুঝতে পারছিনা তো।

আমি বাতাস করে দেবো?

দরকার হবে না মা।

তবে একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর, ঘুম ঠি এসে যাবে।

মা পাশ ফিরলেন।

অনন্যা আবার ডুব দিল অন্তহীন চিন্তার সাগরে। অজয় বলেছে কোন নার্সিং হোমে গিয়ে বিপদ মুক্ত হলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আর সন্তান? সে অজয়ের প্রস্তাবে সায় দিতে পারছে কোথায়? যে আসছে, সে ওর প্রথম সন্তান। প্রথম সন্তানকে আসতে দেবেনা এই পৃথিবীতে?

অনন্যার মনে পড়ল সেই রাতটার কথা। অজয় তার খুড়তুতো বোনদের নিয়ে দীঘায় বেড়াতে গিয়েছিল। অনন্যাকেও ওরা সাথে নিয়েছিল। অজয় সঙ্গে আছে বলে মা কোনরকম নিষেধ করেনি। রেস্ট হাউসে জায়গা না পেয়ে হোটেলে ঘর নিতে হয়েছিল অজয় অবশ্য হু'খানা ঘর ভাড়া করতে চেয়েছিল। অনন্যা নিজেই বাধা দেয়। অজয়ের হুই বোন আর সে, এই তিনজনে অনায়াসে এক বিছানায় কাটাতে পারবে। আর একটা বিছানায় থাকবে অজয়। এর জন্যে আর একখানা ঘর ভাড়া করার কোন প্রয়োজন নেই।

দিনটা ঘুরে ঘুরে কেটে গেল ভালই। রাত ন'টা পর্যন্ত বেড়িয়ে খাবার দাবার সেরে ওরা বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছিল।

অজয় নিজেই ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছিল।

সে রাত্রেও এমনি ঘুম আসছিল না অনন্যার হু'চোখে। অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে শুয়ে উসখুস করছিল। অনন্যা নিজেও বুঝতে পারছিল অজয় জেগে রয়েছে।

একসময় অজয়ই ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করল—

অনন্যা—

কি ?

ঘুম আসছে না ?

না।

আমারো একই অবস্থা।

কেন বলতো ?

কে জানে ! সারাদিন পরিশ্রম করে তো ঘুম আরো বেশী হওয়া উচিৎ। তবু ঘুম আসছে না। আবার চুপচাপ।

ওপাশে বিছানায় অজয় চুপ করে গেছে।

হঠাৎ মনে হল, দরজায় কে যেন বারকয়েক ঘা দিল।

কে ?

চীৎকার করে উঠলাম।

দরজায় তখনো সমানে ঘা দিয়ে চলেছে। আর আমিও মাঝে মাঝে দরজায় ধাক্কা দিয়ে চলেছি। আমার অবস্থা দেখে অজয় হোহো করে হেসে উঠলো।

হাসছো কেন?

তোমার মজা দেখে।

বারে! আমি কি করলাম?

তুমি কি মোটেই বুঝতে পারছো না, বাইরে ঝড় উঠেছে! বাতাসের জন্যে দরজায় শব্দ হচ্ছে। অনন্যা এবার হেসে ফেলল নিজের বোকামিতে।

এই।

অনন্যা অজয়কে ডাকলো।

কি?

বাইরে যাবে?

বাইরে!

অজয় বিস্ময় প্রকাশ করে।

হ্যাঁ।

এই ঝোড়ো রাতে কেউ বাইরে যায়?

যাদের সাহস আছে তারা যায়।

তার মানে বলতে চাও আমার সাহস নেই?

নেই-ই তো।

অনন্যা!

কপট ধমক দেয় অজয়।

ধমকালে কি আমাকে চুপ করাতে পারবে? আমি আবার বলছি তোমার সাহস নেই। নইলে এমন ঝোড়ো রাতে দীঘায় এসে কেউ দরজা বন্ধ করে থাকে?

তুমি ঠিকই বলেছো অনন্যা। এমন ঝড়ের রাতে কেউ ভীতু না হলে, ঘরের দরজা দিয়ে সত্যিই বসে থাকে না।

অজয় লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। তারপর অনন্যার কাছে গিয়ে বলল—

তুমি আমাকে ভীতু বলেছো, যথার্থই বলেছো। আরো একটা বিশেষণ জুড়ে দিতে পারো।

কি বিশেষণ!

অনন্যা হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে। অনন্যা নিজেও বিছানায় উঠে বসেছে।

বোকা।

তুমি বোকা নাকি?

অনন্যা এবার বেশ জোরেই হেসে উঠলো।

আলবৎ বোকা। যাযাবর বলে যান নি, প্রেমে পড়লে ছেলেরা কেমন বোকা বোকা হয়ে যায়!

তাতে কি?

আমি তোমার প্রেমে পড়েছি, আর তার জন্যেই তো বোকা হয়ে গিয়েছি। ফলে বুঝতে পারিনি ঝোড়ো রাতে কেন লোকে বাইরে যায়।

এবার দু'জনেই একসাথে হেসে উঠলো।

সত্যিই যাবে?

অনন্যা এগিয়ে গিয়ে অজয়ের একখানা হাত চেপে ধরল—

এখনো জিজ্ঞাসা করছো যাবো কিনা?

অজয় ততক্ষণে প্যান্ট চাপিয়ে নিয়েছে।

এই?

কি?

কোন বিপদ-আপদ আসবে নাতো?

দাঁড়াও—

অজয় বাক্স খুলে একখানা বেশ বড় আকারের ছোরা ও তিন ব্যাটারীর টর্চ বের করে নিল।

ওটা কি ?

ছোরা।

তোমার ছোরা কেড়ে তোমাকেই আবার কেউ বসিয়ে দেবে না তো।

দ্যাখো অনন্যা, ভারতবর্ষ ওলিম্পিকে স্বর্ণ পদক পায় না বলে সবাই আফসোষ করে, হাহুতাশ করে। ওসব ছেড়ে দিয়ে এই ছোরা খেলাটাকে ওলিম্পিকের মধ্যে ঢোকাতে পারলে, তাহলে দেখতে পেতে ভারতবর্ষ প্রতিটি ওলিম্পিকেই একটা করে সোনার পদক পাচ্ছে।

কে আনতো ?

আমি।

তোমার ঐ ছোরা দিয়ে ?

অফকোর্স। আমার হাতে যদি এই ছোরাখানা থাকে, তাহলে দশজন গুণ্ডারও ক্ষমতা হবে না, গায়ে আমাদের সামান্য একটা আঁচড় দিয়ে যায়। তার উপরে আবার টর্চ আছে।

তাহলে আর দেরী নয়।

তাই চল। দাঁড়াও, সুমিকে উঠিয়ে দিই। আমরা বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে দেবে। দাঁড়াও আমি তুলে দিচ্ছি।

অনন্যা ঝুঁকে পড়ল—

এই সুমি—সুমি ?

কি অনুদি ?

আমরা একটু বেরোচ্ছি, তুমি দরজাটা বন্ধ করে দাও।

এই ঝড়ের মধ্যে ? বাইরে তো দারুণ ঝড় হচ্ছে ?

তোমার দাদার সখ হয়েছে ঝড়ের মধ্যে বেরোবে।

কি—আমার সখ হয়েছে ?

আচ্ছা—আচ্ছা, আমার সখ হয়েছে, হলোতো ? নাও এবার দরজাটা বন্ধ করে দাও।

অজয় আর অনন্যা বাইরে বেরিয়ে এলো। বাইরে এসে দেখলো দারুণ বেগে ঝড় বইছে। ঘরের মধ্যে অতটা বোঝা যায়নি।

এই শোনো—

কি ?

অজয় টর্চ জ্বাললো।

সমুদ্র কি সুন্দর গর্জন করছে !

সুন্দর না ভয়ংকর ?

যাই বল, আমার কিন্তু ভালো লাগছে।

তবে চল।

ওরা দু'জনে নেমে পড়ল।

কানে কিছু সোনার উপায় নেই। সমুদ্রের গর্জন আর ঝাউয়ের শনশন শব্দ। চোখে কিছু দেখার উপায় নেই। চারদিকে বালি আর বালি। কিছু দূরে গেলেই ঝাউবন। সেখানেও শনশন শব্দ। আকাশে ঘন কালো মেঘ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

আমরা শুধু একাই নই অজয়। ঝড় দেখার জন্যে আরো অনেকেই বেরিয়েছে।

অজয় হাসলো।

সমুদ্রের গর্জন আর ঝাউয়ের ক্রন্দন দুয়ে মিলে আশ্চর্য সুন্দর এক ঐকতান চলছে। আকাশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ চমকালো। আলোয় আলোময় হয়ে উঠলো চারিদিক।

দ্যাখো দ্যাখো অজয়, সমুদ্র কি সুন্দর, কি ভয়ংকর !

অজয়ও দেখছিল, শান্ত বঙ্গোপসাগর ঝড়ের সঙ্গে কি ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। পর্বতের মত এক একটা ঢেউ শত শত মাইল দূর থেকে ছুটে আসছে।

অজয় অনন্যার একখানা হাত শক্ত করে চেপে ধরল। ঝড়ের ঝা

দাপট, অনন্যাকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

তোমার পরণের শাড়িখানা ভালকরে গায়ের সাথে জড়িয়ে নাও অনু। নইলে বাতাসে ঠেলে নিয়ে যাবে।

তোমার বুঝি ভয় লাগছে, পাছে বাতাস আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

জোরে জোরে হাসতে শুরু করল অনন্যা।

ভয় পেলে তোমাকে এই ঝোড়ো বাতাসের মধ্যে কিছুতেই আনতাম না অনু। সাবধান হতে ক্ষতি কি?

আচ্ছা অজয়?

কি?

ঐযে পাহাড়ের মত ঢেউগুলো, হঠাৎ যদি প্রচণ্ড বাতাসের টানে আমাদের কাছে চলে আসে?

ভালই হবে। দু'জনে হাতে হাত ধরে আমরা ভেসে বেড়াবো।

কতক্ষণ?

যতক্ষণ শ্বাস থাকবে।

আচ্ছা অজয়, ঐ যে উত্তাল সমুদ্র ঐ সমুদ্রে এখনো তো জাহাজ চলছে?

তা চলবে বৈকি।

জাহাজ ডোবে না?

ডোবে। তেমন বেকায়দায় পড়লে ডোবে বৈকি। তবে আগের মত এখন আর অত ভয় নেই। বিজ্ঞান মানুষকে আত্মরক্ষার অনেক উপায় বলে দিয়েছে।

ধ্বংসের অস্ত্রও যুগিয়েছে বলতে পারো।

তা ঠিক।

অজয় অনন্যার হাতখানা আরো শক্ত করে চেপে ধরল।

তুমি এমন করে ধরেছো যে হাতে লাগছে।

তা একটু লাগুক।

অজয় তেমনি করে ধরে রয়েছে।

পাশ দিয়ে কারা যেন দৌড়াতে দৌড়াতে ঝাউবনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ওরা ভয়ানক জোরে জোরে হাসছে।

এই?

কি?

অজয় সাড়া দিল।

তোমার কাছে তো টর্চ আছে।

কি হবে টর্চ দিয়ে—

চলনা, ঐ ঝাউবনের মধ্যে যাই?

বিদ্যুৎ চমকালো। ক্ষণেকের জন্যে আলোয় ভরে উঠলো চারদিক।

অজয় ঝাউবনের দিকে তাকাল।

বড্ড অন্ধকার ওখানে।

এই বুঝি তোমার সাহস? এই বুঝি তোমার ওলিম্পিক চাম্পিয়ান হওয়া?

তুমি কি সত্যিই যেতে চাও?

চলই না।

শেষে যদি কোন বিপদ হয়, কিছু বলতে পারবে না কিন্তু।

ওটা পুরুষমানুষের মত কথা হল না অজয়।

তবে চল।

অজয় অনন্যার হাত ধরে নিয়ে চলল।

কতদূর পর্যন্ত যাবে?

অনন্যা প্রশ্ন করল।

যতদূর যেতে চাইবে।

তবে তাই হোক অজয়। হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা। তুমি যতদূর নিয়ে যাবে আমি যাবো। অজয় এক হাতে অনন্যার হাত, অন্য হাতে টর্চ ধরে ঝাউবনের দিকে অগ্রসর হল। হাতের টর্চ জ্বালবার কোন দরকার হচ্ছিল না। আকাশে যেভাবে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তাতে প্রায় সব সময়েই চারদিক আলোকিত হয়ে রয়েছে।

আর খানিক গেলেই ঝাউবন শুরু হয়েছে।

অজয় চেয়ে দেখলো ওরা একেবারে নিঃসঙ্গ নয়। ঝড় দেখার জন্যে ও ঝড়ের দীঘাকে দেখার জন্যে ওদের মতো আরো অনেকে বেরিয়েছে।

ওরা এগিয়ে চলল।

আবার একবার বিদ্যুৎ চমকালো। প্রচণ্ড শব্দ হলো, কড় কড় কড়াৎ। কাছাকাছি কোথায় যেন বাজ পড়ল।

থমকে দাঁড়াল অনন্যা।

থামলে যে?

অজয়ও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

না চল।

এগিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াল অনন্যা। আজ কি যেন হয়েছে তার। কেবলই এগিয়ে যাবার জন্যে মনটা উসখুস করছে।

ঝাউবন আর মাত্র কয়েক গজ দূরে।

অনন্যা?

কি?

ঝাউবনের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল অজয়।

আমার মনে হয় আমরা বড্ড বেশী ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি। আমাদের ফিরে যাওয়া উচিৎ।

তুমি হেরে গেলে অজয়। তুমি ভয় পাচ্ছো।

অজয় বুঝতে পারছে না অন্যার আজ কি হয়েছে। কেন ও বিপদের মুখে বার বার যেতে চাইছে? অনন্যা যদি যেতে চায়, ওই বা কেন ভয় পাবে?

বেশ হারবোনা।

অজয় নিজেকে শক্ত করে নিল। তারপর অনন্যার হাত ধরে ঢুকে পড়ল ঝাউ-অরণ্যে। অজয়ের এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে অনন্যার হাত। চারদিকে ঘুরঘুটি অন্ধকার। এপথ যেন অজয়ের চেনা। অন্ধকারেও এপথ দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত চলে যেতে পারবে। তাছাড়া আলো

জ্বালার অর্থ বিপদকে আহ্বান জানানো।
কেমন লাগছে?
কানের কাছে মুখ এনে অনন্যা প্রশ্ন করল।
ঝড়ে ঝাউয়ের ও সমুদ্রের শব্দ এতো জোরে হচ্ছে যে কানের কাছে মুখ এনে খুব জোরে না বললে কিছুই শোনা যাচ্ছে না।
কি?
এই অন্ধকার?
ভালই।
চলো—আরো এগিয়ে যাই অজয়। তুমি আমি দু'জনে হারিয়ে যাই ঐ অন্ধকারের মাঝে। একটা গাছের গুঁড়ির কাছে আসতেই নীচে থেকে কারা যেন এক সাথে চীৎকার করে উঠলো, কৌন হ্যায়!
চমকে উঠলো অনন্যা। দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল অজয়কে।
ও কারা?
নিজেকে কোনরকমে ছাড়িয়ে নিয়ে হাতের টর্চ জ্বালালো অজয়।
চলো পালাই।
আলোর দিকে চোখ পড়তেই দুই হাতে মুখ ঢাকলো অনন্যা।
অজয় নিজেও বিচলিত হয়েছে। আলো নিভিয়ে দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।
তাই চলো।
অজয় অনন্যার হাত চেপে ধরল। অনন্যা এখনো হাঁপাচ্ছে। ওরা কয়েক পা পিছিয়ে এলো।
চারদিকে মিশকালো অন্ধকার। বাতাস ও সমুদ্রের গর্জন।
অনন্যা মনে করে দেখবার চেষ্টা করল—কি দেখেছে!
দুটো অজগর যেন পাক খাচ্ছে।
মাত্র এক মুহূর্তের জন্য দেখেছে অনন্যা।
আচ্ছা ওরাও যদি—আর ভাবতে পারে না অনন্যা।
অজয়?
কিছু বলবে?

চলনা, এই অন্ধকারের মধ্যে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসি।

তাই চল।

ওরা দু'জনে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল।

কৌন হ্যায়?

অন্ধকারের মধ্যে গায়ে পা লাগতেই লোকটা চীৎকার করে উঠেছিল। অজয় তখন তিন ব্যাটারী টর্চের উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। স্বল্প সময়ের আলোয় অনন্যা যে দৃশ্য দেখেছিল সে দৃশ্যের কথা জীবনে কোনদিন ভুলতে পারবে না অনন্যা। দুটো অজগর যেন একে অপরকে জড়িয়ে ধরে পিষে মারছে। অজয় সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভিয়ে দিয়েছিল।

ঐ দৃশ্যটাই অনন্যার মনের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অজয়ের কোন দোষই নেই। সমস্ত দোষ তার নিজের। সেই ডেকে নিয়ে গিয়েছিল অজয়কে সেই প্রকাণ্ড গুড়িটার কাছে। তারপর নিজেই অগ্রসর হয়েছিল। পরিণত হয়েছিল দু'টো অজগরে। বাইরে তখন ঝড়ের গতি আরো অনেক বেড়ে গেছে। বেড়ে গেছে সমুদ্রের গর্জন, ঝাউবনের শনশন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ওরা ফিরে এসেছিল।

দু'জন ঝড়ে বিধ্বস্ত মানুষ।

অনন্যা অন্ধকারের মধ্যেই চোখ মেলল। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মাত্র দু'মাস আগের ঘটনা। এরই মধ্যে অনন্যার মুখে এসেছে অরুচি, এসেছে বমির ভাব। কোনরকমে ফাঁকি দিয়েছে মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে। কিন্তু কতদিন সবাইকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হবে? আজ সকাল পর্যন্তও মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা ছিল। ওষা ভাবছে সব ভুল। অজয় নিজে গিয়েছিল ওর পরিচিত এক ডাক্তারের কাছে, তিনিও ক্ষীণ আশার কথা শুনিয়েছিলেন, নাও হতে পারে। কিন্তু সব

ধুলিস্যাৎ করে দিয়ে গেছে ইউরিন কালচারের রিপোর্ট ! এরপর ?
অজয় বলেছে কোন প্রয়োজন নেই। এই মাসেই সে ওকে নিয়ে যাবে কোন ম্যারেজ রেজিস্টারএর কাছে। তাহলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু সত্যিই কি যাবে ? অসময়ে যখন নতুন অতিথি আসবে ? সবাই যখন ভ্রূকুটি করবে ?
সে বড় লজ্জার হবে। সেই লজ্জা সারাজীবন স্পর্শ করে থাকবে অনন্যাকে। স্পর্শ করে থাকবে অজয়কে। নিজের জন্যে অনন্যা খুব বেশী ভাবে না। তার সমস্ত চিন্তা অজয়কে ঘিরে।
অন্ধকারের মধ্যে খুব সন্তর্পণে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো অনন্যা। অনন্যার ভয়, মা শুনতে পাবেন মেয়ের দীর্ঘশ্বাস।
কিন্তু অনন্যা শুধু মেয়েদের পরিচয় পেয়েছে, মায়ের পরিচয় এখনো পায়নি। সে বুঝতে পারে নি, মা জেগে গেছে। অনন্যা জানে না, মেয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটাবে আর সেই মেয়ের পাশে মা নাক ডাকবে এ হতে পারে না। কিছুতেই হতে পারে না।
অনু ?
মা ? অনন্যা চমকে উঠলো মায়ের ডাক শুনে।
তুই এখনো জেগে আছিস ?
ঘুম আসছে না মা।
কি হয়েছে তোর বলতো ?
কই, কিছুই না তো ?
অনন্যা পাশ ফিরলো।
কোন কিছু হয়নি অথচ এতোরাত পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিস, এ কখনো হতে পারে ?
বলছি তো মা, আমার কিছুই হয়নি।
অনু ?
কি—বল ?
অজয়ের সাথে কোনরকম মন কষাকষি হয়েছে ?

অজয় তেমন ছেলেই নয় মা, আজকের পৃথিবীতে ওরকম ছেলে সত্যিই দুর্লভ।

অজয়কে তুই বিয়ে করবি?

এবার অনন্যা কোন উত্তর দিল না।

মা আবার বললেন—

কাল অজয় এলে, ওর কাছে বিয়ের কথা পারবো?

তুমি কেন পারবে মা? ওরাও তো প্রথমে আসতে পারে।

অনন্যা বাধা দেবার চেষ্টা করে।

তা হয় না অনু, আমাদের মেয়ে। আমরা কন্যাদায়গ্রস্ত। কথাটা আমাদেরই আগে তোলা উচিৎ।

তবে তুমি যা ভাল বোঝ—

তোর মতামত আগে জেনে নেওয়া উচিৎ

আমার অমত নেই।

তাহলে এবার ঘুমাতে চেষ্টা কর। কাল সকালে উঠে যা করার আমি করব।

তুমিও তো জেগে আছো মা?

কেন জাগছি, যেদিন তোর, তোর মত মেয়ে হবে সেদিন বুঝতে পারবি।

কিধার যায়গা সাব?

মৌলালী।

ট্যাক্সিকে গন্তব্যস্থল বলে দিয়ে অজয় পিছনের সিটে নিজেকে ছেড়ে দিল। আমার কিন্তু ভীষণ লজ্জা করছে অজয়।

অনেকক্ষণ পরে অনন্যা প্রথম মুখ খুললো। বাড়ী থেকে বেরিয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি। মনের মধ্যে হাজার রকমের চিন্তা তোলপাড় করেছে

অজয় অনন্যার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল—

ডাক্তারের কাছে যাবে, এতে লজ্জার কি আছে অনন্যা। ধরো তোমার যদি কোন শক্ত অসুখ হত, তখন তো ডাক্তারের কাছে যেতে হত ?

কোথায় অসুখ আর কোথায়—এটা লজ্জার কথা নয় ?

বরং বলতে পারো লজ্জা থেকে মুক্ত হবার কথা।

কোন মেয়ে ডাক্তার নেই ?

অনন্যা তবু প্রশ্ন করে।

হয়তো আছে কিন্তু আমার জানা নেই।

অনন্যা আবার চুপ করে যায়।

ট্যাকসি ফাঁকা রাস্তা পেয়ে দুরন্তগতিতে ছুটছে। দেখতে দেখতে চৌরঙ্গী পিছনে চলে গেল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ধর্মতলা, তারপরেই মৌলালী। আর তারপর—

অনন্যা যেন তারপরের কথা আর ভাবতেও চায় না।

অজয় ওকে উৎসাহিত করার জন্যে বলল—

আজকে তোমার তো এতোটা লজ্জা পাবার কিছু নেই। আজ ডাক্তার মিত্র তোমাকে শুধু পরীক্ষা করে দেখবেন। পরীক্ষা করে যদি বলেন, তবে আগামীকাল আসতে হবে।

না না—আমি মোটেই লজ্জা পাচ্ছি না।

মুখের কোণে সামান্য হাসি ফুটিয়ে অনন্যা নিজের কাছে ও অজয়ের কাছে সহজ হবার চেষ্টা করছে।

এই তো লক্ষ্মীমেয়ের মত কথা।

অজয় ওর হাতে সামান্য চাপ দিল

এই শোনো ?

কি ?

আচ্ছা ডাক্তারবাবুর, মানে ডাক্তার মিত্রের বয়স কতো হবে ?

বছর চল্লিশ।

তাহলে যে বললে এজেড ডাক্তার :

এজেডই তো—চল্লিশ বছর বয়স এজেড নয় !

ছাই এজেড। আজকাল চল্লিশ বছরে মেয়েয়া বিয়ে করছে। খবরের কাগজে পাত্রপাত্রী কলম পড়োনা বুঝি।

অজয় হেসে বলল—

পাত্রী জোটার আগে পড়তাম।

এখন?

ওপাতায় চোখ বোলাতেও ইচ্ছে করে না।

ইস!

হ্যাঁ। কিন্তু তোমার কথায় মনে হচ্ছে, তুমি এখনো পাত্রপাত্রী কলমগুলো রীতিমত পড়ো?

মোটেই না মশাই।

তবে জানলে কি করে যে আজকাল চল্লিশ বছর বয়েসে মেয়েরা বিয়ে করছে?

কান আছেতো—শুনতে পাইনা?

অনন্যা মুখ ভার করে বসল।

অমনি রাগ হল বুঝি?

অজয় ওর হাত ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করল।

এই—এই ছাড়ো, ওকি হচ্ছে, ড্রাইভার রয়েছে না?

ড্রাইভার তো সামনের রাস্তার দিকে চেয়ে রয়েছে।

ওর কপালের উপরে ঐযে অতবড় আয়নাটা, ওটাও বুঝি সামনের দিকে দেখার জন্যে।

আর কিধার যায়গা সাব?

আজয় চেয়ে দেখল, মৌলালীর মোড়ে এসে গেছে।

সি আই টি রোড পাকড়ো।

ড্রাইভার সি আইটি রোড ধরল।

ডাক্তার মিত্রকে দেখতে কেমন বলতো! চুলটুল পেকেছে?

অনন্যা আবার প্রশ্ন করে।

তা চুল পেকেছে কিনা জানিনা, জুলপি পেকেছে।

বড় বড় জুলপি রেখেছে নাকি?

জুলপির প্রশ্ন কেন বলতো?

কারণ, জুলপিওয়াদের আমার বড্ড ভয়।

রোককে ড্রাইভার।

অজয় চেঁচিয়ে উঠলো।

ড্রাইভার অজয়ের চীৎকারে আকৃষ্ট হযে ব্রেক কসেছে।

ডাহিনে সে ওহি যো তিনমহল্লা হ্যায়, উস মকান মে পোঁছা দেও সর্দারজী।

ঠিক হ্যায় সাব।

ড্রাইভার গাড়ী ঘুরিয়ে নিল।

তিনতলা পুরো বাড়ীটা জুড়ে মধ্য কলকাতার সবচাইতে নামী ও দামী নার্সিং হোম মিডল্যাণ্ড। মালিক ডাক্তার এ জেন মিত্র। ডাক্তার মিত্র ছাড়াও আরো তিনজন ডাক্তার আছেন। অজয়ের এক বন্ধুর সাথে ডাক্তার মিত্রের পরিচয়। বন্ধুটিই যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছে।

এসো।

অজয় অনন্যাকে নামাবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল।

বাধা দিয়ে অনন্যা বলল—

আমি নিজেই যেতে পারবো। তারপর হেসে যোগ করল, ভুলে যাচ্ছো কেন আমি দশ মাসের নই, ছ্'মাসের?

অজয় হেসে ফেলল।

ডাক্তার মিত্র তাঁর চেম্বারেই ছিলেন, অজয় পরিচয় দিতেই হাত বাড়িয়ে দিলেন। তারপর বললেন, একটা কল ছিল কিন্তু আপনার টেলিফোন পাবার পর সময় পিছিয়ে দিয়ে আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

এই তে আপনার পেসেণ্ট ডকটর মিত্র।

বসুন মিস মুখার্জী।

ডাক্তার মিত্র ওদের বসতে বলে ঘড়ির দিকে তাকালেন—

আমি কিন্তু বেশী দেরী করতে পারবো না অজয়বাবু। মিস মিত্রকে একজামিন করেই আমাকে আবার বেরোতে হবে।

তাড়াতাড়ি হলে তো আমরাও বেঁচে যাই ডক্টর মিত্র।

ওকে।

কলিং বেলের বোতামে চাপ দিলেন ডক্টর মিত্র। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন বয়স্কা নার্স ঘরের মধ্যে এলেন।

পেসেণ্টকে অপারেশন টেবিলে নিয়ে যান মিসেস বোস। আমি এখুনি যাচ্ছি।

মিসেস বোস হাত বাড়িয়ে দিলেন অনন্যার দিকে।

অনন্যা অজয়ের দিকে তাকাল।

মোটেই দেরী হবে না অনন্যা। তুমি নির্ভয়ে যাও।

এখানে আবার ভয়ের কি? এখানে তো সবাই আসে নির্ভয় হতে।

মুচকি হাসলেন নার্স মিসেস বোস।

ওরা চলে গেল।

অজয় অপেক্ষা করে রইল।

অজয় বসে বসে ডাক্তার মিত্রের চেম্বার দেখতে লাগলো। এরই নাম বিখ্যাত মিডল্যাণ্ড নারসিং হোম। মধ্য কলকাতার অন্যতম সেরা নারসিং হোম। জিনিষপত্রের দিকে চেয়ে অজয়ের বুঝতে দেরী হলনা এদের আয় কত হতে পারে। সমর সোম সবার আগে একটি কথাই অজয়কে বলেছিল; ডাক্তার মিত্রকে বলে সে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা করে দিতে পারে কিন্তু মাইনাস টাকার অংক। টাকার ব্যাপারে ডাক্তার মিত্র ভীষণ একরোখা লোক। একটা পয়সাও তিনি কম নিতে জানেন না।

প্রায় মিনিটি কুড়ি পরে অনন্যা ফিরে এলো।

অজয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলো অনন্যার মুখের দিকে। না দুশ্চিন্তার কোন ছাপ দেখতে পাচ্ছে না অনন্যার মুখে।

অনন্যা হাসি মুখেই এসে বসল অজয়ের পাশে।

অনন্যার ঠিক পেছন পেছনই ডাক্তার মিত্র এলেন।

তাহলে আমরা কালকেই আসছি ডাক্তার বাবু?

হ্যাঁ, কালকেই আসুন দশটার মধ্যে এখানে পৌঁছালেই চলবে।

আমরা তাই আসবো।

দেখবেন, যেন দেরী করবেন না। কাল আমার আরো দুটো পেসেণ্ট আছে।

আমরা দশটার আগেই আসবো।

একটু ইতঃস্তত করে অজয় বলল—

আপনার ফিয়ের টাকাটা কি আজকেই য়্যাডভান্স করে যাবো?

কোন দরকার নেই।

অজয় অনন্যাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

কোন অসুবিধা হয়নি তো?

একটুও না।

তবে যে তুমি ভয় পাচ্ছিলে?

আমি কি এসব কিছু জানতাম?

তাহলে কাল ন'টার সময় তুমি রেডি হয়ে থাকবে। আমি ট্যাকসি নিয়ে সোজা তোমার বাড়ীতে হাজির হব।

মা যদি জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় যাবি?

যাহয় একটা কিছু বলে দিলেই হবে।

দু'জনেই হেসে উঠলো।

পরের দিন দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকী থাকতেই অজয় ও অনন্যা মিডল্যাণ্ড নার্সিং হোমে এলো। আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহ। শরৎ কাল। আকাশ দারুণ নীল। মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। চারদিকে ঝলমলে সোনালী রোদ।

প্রকৃতির সাথে ম্যাচ করে সেজে এসেছে অনন্যা। পরণে ওর

আকাশের মতই নীল মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ী। গায়ে শরতের শুভ্র মেঘখণ্ডের মতই সাদা ব্লাউজ।

অজয়ের পরণে সাদা ধুতি ও সাদা পাঞ্জাবী।

আসুন।

ভেতরে যাবার জন্যে আহ্বান জানালেন ডাক্তার মিত্র।

সময় সম্বন্ধে আপনারা দেখছি অন্যান্যদের মত নন।

অজয় হেসে বলল—

চেষ্টা করি মাত্র। তবে সবসময় হয়ে ওঠে না।

চেষ্টাই বা কয়জনে করে।

ডাক্তার মিত্র কলিং বেল টিপলেন।

কালকের সেই মিসেস বোসই এলেন।

মিসেস বোস?

বলুন স্যার—

অপারেশন থিয়েটার রেডি?

হ্যাঁ।

যন্ত্রপাতি সব?

গরমজল চাপিয়েছি।

আপনি রেডি হয়ে নিন। আমি মিস মুখার্জীকে নিয়ে ঠিক দশটা পনেরোতে ঢুকবো। মিসেস মিত্র চলে গেলেন।

অজয় চেয়ে দেখলো অনন্যার মুখখানা একটু একটু করে ফ্যাকাসে হয়ে উঠছে। ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে—.

তোমাকে নার্ভাস মনে হচ্ছে অনন্যা।

মোটেও নয়।

অনন্যা হাসবার চেষ্টা করল।

নার্ভাস হবার তো কিছুই নেই। এমন কোন বড় ব্যাপার নয়। অপারেশন টেবিলে উঠবেন আর নামবেন।

ডক্টর মিত্র সাহস দেবার জন্য হাসলেন।

তবু সহজ হতে পারছে না অনন্যা। একটা ভয় সঙ্কোচ ও লজ্জা বার বার মনকে প্রভাবিত করছে।

দশটা বেজে পাঁচ মিনিটের সময় ডাক্তার মিত্র উঠে পড়লেন।

চলুন মিস মুখার্জী

অনন্যা ঘড়ির দিকে চাইল।

পাঁচ মিনিট আগেই যাই।

অনন্যা এবার অজয়ের কাছে সরে এল।

চলি ?

এসো।

ডাক্তার মিত্র এগিয়ে গেছেন। ডাক্তারকে ধরার জন্য জোরে জোরো পা চালাল অনন্যা। অপারেশন থিয়েটারের সামনে এসে ডাক্তার মিত্র নিজেই দরজা খুলে ধরলেন।

যান ভেতরে যান।

অনন্যা ভেতরে এলো। সেই সাথে ডাক্তার মিত্রও ফিরে এলেন।

মিসেস বোস দেখছি এখনো আসেনি।

ডাক্তার মিত্র অনন্যার সামনে এগিয়ে গেলেন।

দেখুন মিস মুখার্জী. ঐদিকে কাপড় ছাড়ার জায়গা রয়েছে। আপনি জামা-কাপড় ছেড়ে আস্থন। অনন্যা ছোট্ট কাঠের পার্টিশনের ওপাশে চলে গেল। ওখানে ড্রেসিং টেবিল থেকে কাপড় রাখার আলনা পর্যন্ত সবই রয়েছে।

ডাক্তার মিত্র দরজা খুলে বাইরে গেছেন। হয়তো মিসেস বোসের খোঁজে।

অনন্যা শাড়ীতে হাত দিতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। গতকাল শাড়ী খোলার কোন ব্যাপারই ছিল না। কোমরের কাছে কাপড় ও সায়াটা ঢিলে করে একটু নামিয়ে দিতে হয়েছিল শুধু। আবার ভাবল, খুলতে যখন হবেই, দেরী করে কি লাভ !

আয়নার কাছে সরে গিয়ে শাড়ীর কোঁচা ধরে টান দিল। টান

দিতেই শাড়ী খুলে বেরিয়ে এলো সায়া।

অনন্যা আয়নার দিকে তাকাল।

নীলরঙের ভারী সিল্কের সায়া ওর পরণে।

এটাও খুলতে হবে।

সায়ার দড়িতে হাত দিয়ে ইতস্তত করছিল অনন্যা। গায়ে দেবার জন্যে সাদা এপ্রোন থাকে, এপ্রোন কোথায়?

ওপাশে দরজা খোলার শব্দ হল।

মিস মুখার্জী!

এই যে ডাক্তার বাবু—

আপনি রেডি হয়েছেন?

ততক্ষণে হাত ফস্কে ভারী সিল্কের সায়াটা অনন্যার মসৃণ উরু বেয়ে নীচে নেমে গেছে। আমি তৈরী।

টেবিলে চলে আসুন।

ইতস্তত করল অনন্যা। মিসেস বোস এখনো আসেন নি?

মিসেস বোস হঠাৎ অন্য কাজে গেছেন। আমি মিসেস ভাদুড়ীকে বলেছি আসতে। আপনি কিন্তু আর দেরী করবেন না। তাড়াতাড়ি চলে আসুন।

অনন্যাকে যেতেই হল। গায়ে শুধু সাদা ব্লাউজ, নিম্নাঙ্গে কিছুই নেই। সেই অবস্থাতেই এপাশে বেরিয়ে এলো অনন্যা

একি!

ঠিক যেন ধমক দিয়ে উঠলেন ডাক্তার মিত্র।

কেন ডাক্তার মিত্র?

গায়ের ব্লাউজ খোলেন নি কেন?

গায়ের ব্লাউজ! খুলতে হবে?

আপনি জানেন না? অপারেশন টেবিলে কোন পোষাক গায়ে রেখে উঠতে নেই?

আমি জানতাম না।

এখন তো জানলেন, এবার খুলে ফেলুন। আচ্ছা দাঁড়ান, আমি খুলে দিচ্ছি।

অনন্যার গয়ের ব্লাউজটা খুলে দেবার জন্যে ডাক্তার মিত্র হাত বাড়ালেন।

এক পা পিছিয়ে গেল অনন্যা, দৃষ্টি আনত করে বলল—

আপনি কেন কষ্ট করবেন ডাক্তার মিত্র, আমি নিজেই খুলছি।

ব্লাউজটা খুলে ফেলল অনন্যা।

এখন ওর গায়ে শুধুমাত্র একটা ব্রা।

এটা থাকবে ?

না।

বাধ্য হয়ে ওটাও খুলে ফেলতে হল।

অনন্যা এবার সম্পূর্ণ নিরাবরণ

সামনে ডাক্তার মিত্র।

লজ্জায় দু'চোখের পাতা এক হয়ে এলো। অনন্যার জীবনে এই প্রথম কোন পুরুষের দৃষ্টির সামনে নিজের নিরাবরণ দেহটাকে তুলে ধরতে হল। অজয়ও তাকে এমন করে দেখেনি। আর সেই রাত, সেটা তো ছিল অন্ধকারে ঢাকা।

আপনি ডান পাশের ঐ নীচু টেবিলটাতে গিয়ে শুয়ে পড়ুন মিস মুখার্জী।

অনন্যা কোনরকমে এগিয়ে গেল। তারপর কোনরকমে শুয়ে পড়ল টেবিলটার উপরে। এখুনি ডাক্তার মিত্র এগিয়ে আসবেন।

লজ্জায় চোখ বন্ধ করল অনন্যা।

বোধহয় কয়েকটা মিনিট কেটে গেল।

বিস্মিত হল অনন্যা। ডাক্তার মিত্র এখনো আসছেন না কেন ?

চোখ মেলে তাকাতে গিয়েই ভয়ানক চমকে উঠলো। ডাক্তার মিত্র অনন্যার অজ্ঞাতে কখন এসে উপস্থিত হয়েছে টেরই পায়নি।

ডাক্তার মিত্র সম্পূর্ণ উলঙ্গ। ওর দেহে কোন পোষাক নেই।

দিতেই শাড়ী খুলে বেরিয়ে এলো সায়া।
অনন্যা আয়নার দিকে তাকাল।
নীলরঙের ভারী সিল্কের সায়া ওর পরণে।
এটাও খুলতে হবে।
সায়ার দড়িতে হাত দিয়ে ইতস্তত করছিল অনন্যা। গায়ে দেবার জন্যে সাদা এপ্রোন থাকে, এপ্রোন কোথায়?
ওপাশে দরজা খোলার শব্দ হল।
মিস মুখার্জী!
এই যে ডাক্তার বাবু—
আপনি রেডি হয়েছেন?
ততক্ষণে হাত ফস্কে ভারী সিল্কের সায়াটা অনন্যার মসৃণ উরু বেয়ে নীচে নেমে গেছে। আমি তৈরী।
টেবিলে চলে আসুন।
ইতস্তত করল অনন্যা। মিসেস বোস এখনো আসেন নি?
মিসেস বোস হঠাৎ অন্য কাজে গেছেন। আমি মিসেস ভাদুড়ীকে বলেছি আসতে। আপনি কিন্তু আর দেরী করবেন না। তাড়াতাড়ি চলে আসুন।
অনন্যাকে যেতেই হল। গায়ে শুধু সাদা ব্লাউজ, নিম্নাঙ্গে কিছুই নেই। সেই অবস্থাতেই এপাশে বেরিয়ে এলো অনন্যা।
একি!
ঠিক যেন ধমক দিয়ে উঠলেন ডাক্তার মিত্র।
কেন ডাক্তার মিত্র?
গায়ের ব্লাউজ খোলেন নি কেন?
গায়ের ব্লাউজ! খুলতে হবে?
আপনি জানেন না? অপারেশন টেবিলে কোন পোষাক গায়ে রেখে উঠতে নেই?
আমি জানতাম না।

এখন তো জানলেন, এবার খুলে ফেলুন। আচ্ছা দাঁড়ান, আমি খুলে দিচ্ছি।

অনন্যার গয়ের ব্লাউজটা খুলে দেবার জন্যে ডাক্তার মিত্র হাত বাড়ালেন।

এক পা পিছিয়ে গেল অনন্যা, দৃষ্টি আনত করে বলল—

আপনি কেন কষ্ট করবেন ডাক্তার মিত্র, আমি নিজেই খুলছি।

ব্লাউজটা খুলে ফেলল অনন্যা।

এখন ওর গায়ে শুধুমাত্র একটা ব্রা।

এটা থাকবে?

না।

বাধ্য হয়ে ওটাও খুলে ফেলতে হল।

অনন্যা এবার সম্পূর্ণ নিরাবরণ

সামনে ডাক্তার মিত্র।

লজ্জায় দু'চোখের পাতা এক হয়ে এলো। অনন্যার জীবনে এই প্রথম কোন পুরুষের দৃষ্টির সামনে নিজের নিরাবরণ দেহটাকে তুলে ধরতে হল। অজয়ও তাকে এমন করে দেখেনি। আর সেই রাত, সেটা তো ছিল অন্ধকারে ঢাকা।

আপনি ডান পাশের ঐ নীচু টেবিলটাতে গিয়ে শুয়ে পড়ুন মিস মুখার্জী।

অনন্যা কোনরকমে এগিয়ে গেল। তারপর কোনরকমে শুয়ে পড়ল টেবিলটার উপরে। এখুনি ডাক্তার মিত্র এগিয়ে আসবেন।

লজ্জায় চোখ বন্ধ করল অনন্যা।

বোধহয় কয়েকটা মিনিট কেটে গেল।

বিস্মিত হল অনন্যা। ডাক্তার মিত্র এখনো আসছেন না কেন?

চোখ মেলে তাকাতে গিয়েই ভয়ানক চমকে উঠলো। ডাক্তার মিত্র অনন্যার অজ্ঞাতে কখন এসে উপস্থিত হয়েছে টেরই পায়নি।

ডাক্তার মিত্র সম্পূর্ণ উলঙ্গ। ওর দেহে কোন পোষাক নেই।

একি ডাকতার মিত্র !!

অনন্যা উঠে বসতে গেল।

বাধা দিলেন ডাকতার মিত্র।

উঁহু, উঠবেন না।

অপারেশনের সময় কোন ডাকতার যে উলঙ্গ হয়, এ তো জানতাম না ?

হয়।

না ডাকতার মিত্র। এমন আজব কথা আমি শুনিনি।

ডাকতারদের সম্বন্ধে কতটুকুই বা আপনি শুনেছেন মিস অনন্যা মুখার্জী ?

আমি কিছুই শুনতে চাই না।

উত্তেজিত অনন্যা টেবিলের উপর উঠে বসল।

করতে হবে না আমাকে রিলিজ, আমাকে যেতে দিন।

চলে যেতে চান ?

হ্যাঁ !

কিন্তু আপনার তো যাওয়া হবে না।

কেন ?

আপনাকে যে রিলিজ করবো বলে এনেছি।

বেশ তো, আপনার যা চার্জ নিয়ে নেবেন।

উত্তেজনায় রাগে ফেটে পড়ছে অনন্যা।

নিঃশব্দে হাসলেন ডাকতার মিত্র। অনন্যার মনে হল ডাকতার মিত্রের হাসি ওর সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু আপনার তো কিছুতেই যাওয়া চলবে না

কেন ?

আপনাকে যে রিলিজ হতেই হবে।

আমি যদি না হতে চাই ?

তবু আপনাকে হতেই হবে।

আপনি কি জোর করবেন ?

প্রয়োজন হলে, আপনি বেশী বড়াবাড়ি করলে, জোর করতেই হবে।

যাবার জন্যে পথ দেবেন কিনা বলুন।

অনন্যা লাফ দিয়ে টেবিল থেকে নামতে গেল।

ডাকতার মিত্র খপ করে অনন্যার একখানা হাত চেপে ধরলেন। বললেন—

আপনি এর আগে কখনো রিলিফ হতে আসেন নি তাই এমন করছেন ; বেশী বাধা দেবেন না। আমার দেহেরও তো একটা প্রয়োজন আছে। আপনার এই দেহের সান্নিধ্যে এসে আমার দেহের প্রয়োজনটা যদি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তাকে তো মুক্তি দিতেই হবে।

এটাই কি আপনার পেশা ?

আমিও মানুষ, আমারও কামনা বাসনা আছে।

তাবলে এইভাবে অন্যায় পথে ?

আপনি অন্যায় করতে আসেন নি ?

সব ডাকতারদের আমি এতদিন শ্রদ্ধাই করতাম। কিন্তু আপনার মাতো যে কেউ কেউ পাষণ্ডও আছে জানতাম না !

ডাকতারদের এই রূপ আপনি কোনদিন দেখেন নি তাই—

দেখুন ডাকতার মিত্র, এই মুহূর্তে আমাকে এ ঘর ছেড়ে যেতে না দিলে আমি চীৎকার করে অজয়কে ডাকবো।

তাতে কোন ফলই হবে না মিস মিত্র।

মানে ?

এবার ভয় পেয়ে যায় অনন্যা। তবু কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—

আপনাকে এরজন্য পুলিশে যেতে হবে।

তার আগে মিস মুখার্জী, আমি যদি ফোনটা তুলে নিয়ে লাল বাজারে খবর দেই, আপনি এখানে য়্যাবরসন করাতে এসেছেন, তাহলে কাকে

জেলে যেতে হবে ?

সত্যিসত্যিই এবার ভয় পেয়ে যায় অনন্যা।

ডাকতার মুখার্জী এবার এগিয়ে এলেন অনন্যার কাছে। ওকে পাঁজা কোলে করে তুলে নিলেন টেবিলে। বললেন—

আগে গোলমাল করে কেউ লাভবান হতে পারেন নি, আপনিও হবেন না। অতএব যাকরি বাধা দেবেন না। শান্ত হায়ে থাকুন। আমার সাথে আপনারও প্রয়োজন মিটবে, আপনি হাসতে হাসতে বেরিয়ে যেতে পারবেন।

ডাকতার মিত্র এগিয়ে আসছেন।

চোখ বুঁজলো অনন্যা। প্রতিবাদের সমস্ত ভাষা সমস্ত শকতি হারিয়ে ফেলেছে।

ঠিক ছুই ঘণ্টা পরে বেরিয়ে এলো অনন্যা। হাসতে হাসতে অজয়কে বলতে হল, না কোন অসুবিধাই হয়নি। অপারেশন থিয়েটারে যা ঘটে গেল, সেকথা কাউকে বলা যায় না। এমনকি অজয়কেও না।

—